ইসলাম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ডক্টর মো. আখতারুজ্জামান

মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

ড. মোহাম্মদ ইউছুফ

মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ

ইকবাল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শরীফ

প্রথম প্রকাশ	:	সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ধর্মীয় শিক্ষাকে জীবনঘনিষ্ঠ করতে এবং শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে নিজ ধর্মের মৌলিক রীতিসমূহের পরিচিতি প্রদান জরুরি। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটিয়ে ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য **ইসলাম শিক্ষা** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে পরিবার, সমাজ, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় সেসব দিক বিবেচনায় রেখে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম	আকাইদ	১–১৭
দ্বিতীয়	ইবাদত	১৮–৪৩
তৃতীয়	কুরআন ও হাদিস শিক্ষা	৪৪–৭৭
চতুর্থ	আখলাক	৭৮–৯৭
পঞ্চম	আদর্শ জীবনচরিত	৯৮–১১২

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ (اَلۡعَقَائِدُ)

'আকাইদ' আরবি শব্দ। এটি বহুবচন। এর অর্থ হলো বিশ্বাসমালা। এর একবচন হলো 'আকিদাহ' (اَلۡعَقِيۡدَةُ), যার অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাসকেই 'আকাইদ' বলা হয়। যেমন: আল্লাহ, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, আখিরাত, তকদির, পুনরুত্থান ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- আকাইদের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- তাওহিদের (একত্ববাদ) ধারণা, তাৎপর্য ও তাওহিদে বিশ্বাসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অর্থসহ কালিমা তায়্যিবা ও কালিমা শাহাদাত শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে, বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ইমান মুজমাল (ইমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়) অর্থসহ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে, বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আল্লাহর কতিপয় গুণবাচক নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রিসালাতের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আখিরাতের ধারণা, বিশ্বাসের গুরুত্ব ও পর্যায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নৈতিকতা উন্নয়নে 'আকাইদ'-এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ ১

তাওহিদ (اَلتَّوۡحِيۡدُ)

তাওহিদের ধারণা

তাওহিদ (تَوۡحِيۡدُ) আরবি শব্দ। বাংলা ভাষায় একে বলা হয় একত্ববাদ। আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করাকে তাওহিদ বা একত্ববাদ বলা হয়। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনিই হলেন একমাত্র ইলাহ। তিনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। আল্লাহ তায়ালার প্রতি এরূপ বিশ্বাসই হলো তাওহিদ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمۡ يَلِدۡ ۙ وَلَمۡ يُوۡلَدۡ ۙ وَلَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

অর্থ: বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন (সকলেই তার মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১-৪)

আল্লাহ তায়ালার পরিচয়

আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সত্তাগতভাবে যেমনি একক, তেমনি গুণাবলিতেও তুলনাহীন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ একক সত্তা। তার কোনো সমকক্ষ নেই। তিনি কারো সন্তান নন। আবার কেউ তার সন্তানও নয়। গুণাবলির দিক থেকেও মহান আল্লাহ অদ্বিতীয়। তিনি সকল গুণের আধার। তিনি চিরস্থায়ী,

চিরঞ্জীব, শাশ্বত ও সত্য। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, পুরস্কারদাতা, শাস্তিদাতা ইত্যাদি। তিনি 'লা-শারিক'। তার সমান বা সমকক্ষ কেউ নেই। তার গুণাবলির সাথে কোনো কিছুরই তুলনা করা যায় না। তার তুলনা একমাত্র তিনি নিজেই।

তাওহিদের তাৎপর্য

আমরা আমাদের চারপাশে নানারকম জিনিস দেখতে পাই। সুন্দর সুন্দর ফুল, ফল, গাছপালা, তরুলতা, পশুপাখি ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে নদীনালা, পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল, সাগর, মহাসাগর। আরও আছে বিশাল আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি। আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না এমন অনেক বস্তু এবং প্রাণীও রয়েছে। এসব কিছুই সৃষ্টিজগতের অন্তর্গত। এগুলো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া নিজ থেকে সৃষ্ট হয়নি। নিশ্চয়ই একজন স্রষ্টা এগুলো সৃষ্টি করেছেন। তিনি হলেন মহান আল্লাহ। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তার কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়নি। তিনি 'হও' (কুন) বলার সাথে সাথেই সবকিছু সৃষ্টি হয়ে যায়।

বিশ্বজগতের সবকিছুই তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এগুলো থেকে উপকার লাভ করে। সুতরাং মানুষের উচিত তার স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এক আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও ইবাদত করা। তার ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক করা যাবে না। এভাবে মহান আল্লাহর তাওহিদ বা একত্ববাদের প্রতি অনুগত হলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে পারে।

তাওহিদে বিশ্বাসের গুরুত্ব

তাওহিদ বা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস আকাইদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইমান ও ইসলামের মূলভিত্তি হলো তাওহিদ। তাওহিদে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না। সকল নবি-রাসুল (আ.) তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। সকলেই ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তার তুল্য কিছুই নেই। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করে। আর তাওহিদে বিশ্বাসীগণ আখিরাতে জান্নাত লাভ করবেন।

তাওহিদে বিশ্বাসের উদাহরণ

আমরা সকলেই হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর নাম শুনেছি। তিনি ছিলেন একজন নবি ও রাসুল। তিনি এক মূর্তিপূজক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মন্দিরের পুরোহিত। তাঁর সময়ের লোকজন আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদে বা তাওহিদে বিশ্বাস করত না। বরং তারা মূর্তিপূজা করত। তাদের রাজা নমরূদের উপাসনা করত। হযরত ইবরাহিম (আ.) এসব করতেন না। তিনি ভাবলেন মূর্তি বা নমরূদ কোনো কিছুর স্রষ্টা হতে পারে না। কেননা এগুলো নিজেরাই ধ্বংসশীল। সুতরাং এদের উপাসনা করা ঠিক নয়।

এভাবে তিনি স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি ভাবলেন যে আকাশের তারকা, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি হয়তো মানুষের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু এগুলো একে একে অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি বুঝতে পারলেন যে এগুলো মানুষের স্রষ্টা বা ইলাহ নয়। কেননা এগুলো কোনোটাই স্থায়ী নয়। এরা অস্ত যায়, অদৃশ্য হয়। বরং এ সবকিছু যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন তিনিই ইলাহ, তিনিই মাবুদ। অতঃপর তিনি সেই অদৃশ্য সত্তার প্রতি ইমান আনলেন ও তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপন

করলেন। এভাবে বিশ্বজগতের নানা সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে হযরত ইবরাহিম (আ.) মহান আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করলেন।

অতএব, তাওহিদ অর্থ একত্ববাদ। আল্লাহ তায়ালা তার সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অদ্বিতীয়। আমরা তাওহিদে বিশ্বাস করব এবং সে অনুযায়ী আমল করব। আল্লাহ তায়ালার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করব না।

তাওহিদের শিক্ষা

আকাইদের সর্বপ্রথম ও প্রধান বিষয় হলো তাওহিদ। তাওহিদ অর্থ আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা, তার সঙ্গে কাউকে শরিক না করা। তাওহিদ থেকে আমরা নিম্নলিখিত শিক্ষা লাভ করতে পারি :

১. আমরা আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করবো এবং তার সাথে কাউকে শরিক করবো না।
২. আমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত করবো, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করবো না।
৩. আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর সবকিছু তিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য আমরা সর্বদা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবো।
৪. আল্লাহ তায়ালা বিপদ-আপদ থেকে একমাত্র মুক্তিদাতা। সুতরাং বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য আমরা সবসময় আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবো।
৫. আমরা আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ জানবো ও সেইসব নামে তাকে ডাকব এবং আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করবো।
৬. আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবসময় দেখছেন এবং আমাদের সকল কাজের হিসাব রাখছেন। সুতরাং আমরা সর্বদা ভালো কাজ করবো এবং অন্যায়, অত্যাচার ও সর্বপ্রকার পাপ কাজ থেকে দূরে থাকব।

কাজ : শ্রেণির সব শিক্ষার্থী দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে। একদল তাওহিদের পরিচয় ও তাৎপর্য সম্পর্কে বলবে। অন্যদল একটি উদাহরণের মাধ্যমে তাওহিদে বিশ্বাসের গুরুত্ব সম্পর্কে বলবে।

পাঠ ২
কালিমা তায়্যিবা (كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল।

তাৎপর্য

কালিমা তায়্যিবা অর্থ হলো পবিত্র বাক্য। এটি তাওহিদ, ইমান ও ইসলামের মূলভিত্তি। এ কালিমা স্বীকার না করলে কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। এ কালিমার দুটি অংশ।

প্রথম অংশ : لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ)

২০২৫

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই। অর্থাৎ পৃথিবীতে ইলাহ বা ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনি ব্যতীত আর কেউ উপাস্য হতে পারে না। চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, পাহাড়, পর্বত, বাঘ-সিংহ, রাজা-বাদশাহ কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। বরং এসবের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাই হলেন একমাত্র মাবুদ। তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদত বা উপাসনা করা যাবে না। এমনকি তার ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক করাও যাবে না। আরবি 'লা-ইলাহা' শব্দের অর্থ কোনো ইলাহ নেই; আর 'ইল্লাল্লাহ' অর্থ আল্লাহ ছাড়া। কালিমার এ অংশটি না-বোধক শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কোনো পাত্রে ভালো কিছু নেওয়ার আগে প্রথমে ঐ পাত্রটি খালি করে ফেলি। যেন ঐ জিনিসটি অন্য কিছুর সাথে মিশ্রিত না হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে। যেমন : একটি গ্লাসে পানি রয়েছে। তুমি যদি ঐ গ্লাসে দুধ নিতে চাও তাহলে কী করবে? প্রথমে গ্লাসের পানিটুকু ফেলে দেবে। তাই না? এরপর খালি গ্লাসে দুধ নেবে। গ্লাসে পানি রেখে দিয়ে তাতে দুধ নিলে দুধ আর পানি মিশ্রিত হয়ে যাবে। ফলে দুধের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাবে। তদ্রূপ তাওহিদে বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজন পবিত্র অন্তর। অর্থাৎ প্রথমে অন্তর থেকে সবরকমের ভুল ও ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করতে হবে। 'লা-ইলাহা' দ্বারা এটাই করা হয়। অতঃপর 'ইল্লাল্লাহ' দ্বারা আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হবে।

আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) যখন মক্কা নগরীতে ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখন আরবের লোকেরা ছিল মূর্তিপূজক। তারা নানারূপ মূর্তি, গাছপালা, চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়, পর্বত ইত্যাদির পূজা করত। এজন্য রাসুল (স.) এ কালিমার দাওয়াত দেন। ফলে আরবের লোকজন মূর্তিপূজা থেকে অন্তরকে পরিষ্কার করে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।

দ্বিতীয় অংশ : مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ)

অর্থ : মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল। অর্থাৎ মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবি ও রাসুল। এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন ইমানের অংশ। কালিমা তায়্যিবার প্রথম অংশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেমন জরুরি, দ্বিতীয় অংশের প্রতি ইমান আনাও তেমনই আবশ্যক। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের পাশাপাশি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। কেননা তাঁর মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ করি। তিনিই আমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। ভালোমন্দ, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি তিনিই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আর এসব তিনি নিজ থেকে শিক্ষা দেননি। বরং মহান আল্লাহর নির্দেশেই শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করব যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ তায়ালার মনোনীত বান্দা। তিনি নবি ও রাসুল। তিনি যে বাণী নিয়ে এসেছেন তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। যাতে রয়েছে মানুষের জীবন পরিচালনার যথার্থ বিধিবিধান।

কালিমা তায়্যিবা ইমানের মূলভিত্তি। অতএব, আমরা শুদ্ধভাবে এ কালিমা পড়ব। এর অর্থ বুঝে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করব এবং এর মর্মানুসারে জীবনের সকল কাজ পরিচালনা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে বাড়ি থেকে বড় একটি কাগজে 'কালিমা তায়্যিবা' অর্থসহ লিখে একটি পোস্টার তৈরি করে নিয়ে আসবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩
কালিমা শাহাদাত (كَلِمَةُ شَهَادَةٍ)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

উচ্চারণ : আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তার কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (স.) তার (আল্লাহর) বান্দা ও রাসুল।

তাৎপর্য

কালিমা শাহাদাত হলো– সাক্ষ্যদানের বাক্য। অর্থাৎ এ কালিমা দ্বারা ইমানের সাক্ষ্য দেওয়া হয়। আমরা এ কালিমা উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ ও মুহাম্মদ (স.)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের রব। তিনি আমাদের রিজিক দেন, প্রতিপালন করেন, সুস্থতা দান করেন। তিনি আমাদের নানারূপ নিয়ামত দান করেন। আলো, বাতাস, পানি, খাদ্য, সবকিছুই তার দান। সুতরাং আমাদের উচিত তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অপরদিকে হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবি ও রাসুল। তিনিই আমাদের নিকট আল্লাহ পাকের পরিচয় তুলে ধরেছেন। সত্য, মিথ্যার পার্থক্য শিখিয়েছেন। জান্নাতে যাওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। সুতরাং সকল কাজে তার আনুগত্য করা এবং তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করাও অত্যাবশ্যক।

কালিমা শাহাদাতের মাধ্যমে আমরা এ দুটো কাজই করতে পারি। তাছাড়াও মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি আমাদের বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে পারি।

কালিমা তায়্যিবার ন্যায় কালিমা শাহাদাতও দুটি অংশে বিভক্ত। যথা–

প্রথম অংশ : أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ (আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু)

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তার কোনো শরিক নেই।

এ কথার দ্বারা তাওহিদ বা একত্ববাদের সাক্ষ্য দেওয়া হয়। অর্থাৎ আমরা এর দ্বারা সাক্ষ্য দেই যে, মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তার সত্তা ও গুণাবলিতে একক। তার কোনো শরিক বা সমতুল্য নেই। ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা কাউকে তাঁর শরিক করি না।

দ্বিতীয় অংশ : وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ (ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু)

অর্থ : আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (স.) তার বান্দা ও রাসুল।

কালিমার এ অংশ দ্বারা মুহাম্মদ (স.)-এর রিসালাতের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ আমরা স্বীকার করি যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবি ও রাসুল। তিনি নিজে আল্লাহ নন কিংবা আল্লাহর অংশও নন। বরং তিনি হলেন আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা। তিনিও আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতেন।

তবে তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তিনি আল্লাহ্ তায়ালার মনোনীত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল। তিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী আমাদের নিকট পৌছিয়েছেন।

কালিমা শাহাদাত ইমানের অন্যতম প্রধান বাক্য। এর দ্বারা মানুষ নিজ ইমানের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। সুতরাং আমরা শুদ্ধভাবে এ কালিমা পড়ব এবং এর মর্মার্থ অনুসারে আমল করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা একে অপরকে কালিমা শাহাদাত অর্থসহ মুখস্থ শোনাবে।

পাঠ ৪
ইমান মুজমাল (اِيْمَانٌ مُجْمَلٌ)

أٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَ صِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ-

উচ্চারণ : আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বি আসমাইহি ওয়া সিফাতিহি ওয়া কাবিলতু জামি'আ আহকামিহি ওয়া আরকানিহি।

অর্থ : আমি 'ইমান' আনলাম আল্লাহর উপর, ঠিক তেমনি যেমন আছেন তিনি, তার সকল নাম ও গুণসহ। আর আমি তাঁর সকল হুকুম ও বিধিবিধান গ্রহণ করে নিলাম।

তাৎপর্য

'ইমান' শব্দের অর্থ বিশ্বাস। আর 'মুজমাল' অর্থ সংক্ষিপ্ত। অতএব, ইমান মুজমাল অর্থ সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস। সংক্ষেপে আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও আনুগত্য স্বীকার করাকে ইমান মুজমাল বলা হয়। এ বাক্য দ্বারা আমরা পুরোপুরিভাবে আল্লাহ তায়ালার কর্তৃত্ব ও বিধান স্বীকার করে থাকি।

আল্লাহ্ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অতুলনীয়। কোনো কিছুই তার তুল্য নয়। আবার তার ন্যায়ও অন্য কিছু নেই। তার সত্তা ঠিক তারই মত। কোনো মানুষ তার সত্তা, আকার আকৃতির কল্পনা করতে পারে না। তিনি যেমন আছেন সেরূপই তাকে বিশ্বাস করতে হবে। তার সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। তিনি সকল গুণের অধিকারী। সবরকম গুণ তার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। এসব নাম ও গুণের প্রতি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে।

মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি নানা আইন-কানুন প্রদান করেছেন। নবি-রাসুলগণ এগুলো মানুষের নিকট পৌছিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার দেওয়া এসব বিধিবিধান মানুষকে সফলতা ও মুক্তি দান করে। এগুলো অনুসরণ করলে, মেনে চললে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা সর্বদা তার আদেশগুলো মেনে চলব। যেসব কাজ থেকে মহান আল্লাহ আমাদের নিষেধ করেছেন সেসব কাজ বর্জন করব।

আমরা ইমান মুজমাল শুদ্ধরূপে পড়ব। এর অর্থ বুঝে আন্তরিকভাবে তা স্বীকার করব। আর জীবনের সর্বাবস্থায় এবং সকল কাজে আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ মেনে চলব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা একে অপরকে ইমান মুজমাল অর্থসহ মুখস্থ শোনাবে এবং তা নিজেদের খাতায় লিখে একে অপরকে দেখাবে।

পাঠ ৫
আল-আসমাউল হুসনা (اَلْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى)

আল-আসমাউল হুসনা আরবি শব্দ। আল-আসমা শব্দের অর্থ নামসমূহ। আর হুসনা অর্থ সুন্দরতম। অতএব, আল-আসমাউল হুসনা অর্থ সুন্দরতম নামসমূহ। আল্লাহ তায়ালার সুন্দর সুন্দর নামকে একত্রে আল-আসমাউল হুসনা বলা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন—

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

অর্থ: "আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব, তোমরা তাকে সেই সব নামেই ডাকবে।" (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ১৮০)

আল্লাহ তায়ালা সকল গুণের আধার। যেমন: তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, ক্ষমাশীল, দয়াবান, ধৈর্যশীল, সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, প্রতিপালক ইত্যাদি। এমন কোনো গুণ নেই যা তার মধ্যে নেই। এসব গুণের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। এগুলো হলো গুণবাচক নাম। গুণবাচক এসব নামই আল-আসমাউল হুসনা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাকের অনেক গুণবাচক নামের উল্লেখ আছে। আমরা আল্লাহ পাকের ৯৯টি (নিরানব্বইটি) গুণবাচক নামের কথা জানি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর গুণবাচক নামের কোনো শেষ নেই। এগুলো অসংখ্য। তবে বেশি উল্লেখযোগ্য হলো এ নিরানব্বইটি নাম।

এসব নাম আল্লাহ তায়ালার পরিচয় প্রকাশ করে। যেমন: আল্লাহু খালিক। খালিক অর্থ সৃষ্টিকর্তা বা স্রষ্টা। সুতরাং আমরা এ নাম দ্বারা বুঝতে পারি যে, এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা হলেন মহান আল্লাহ। এভাবে গুণবাচক নামসমূহ দ্বারা আমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভালোভাবে চিনতে পারি। ফলে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা সহজ হয়। আল্লাহ তায়ালার এসব গুণ আমরা অনুশীলন করব। এতে আমাদের চরিত্র সুন্দর হবে। সকলেই আমাদের ভালোবাসবে। আল্লাহ তায়ালাও আমাদের ভালোবাসবেন।

আল্লাহু মালিক (اَللّٰهُ مَالِكٌ)

আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর মালিক। মালিক অর্থ অধিকারী। তিনি আসমান জমিন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়, পর্বত, গাছপালা, নদী, সাগর সবকিছুর অধিপতি। সকল কিছুই তার নির্দেশে পরিচালিত হয়। কোনো কিছুই তার আদেশ লঙ্ঘন করে না। পশুপাখি, কীটপতঙ্গের মালিকও তিনিই। পৃথিবীতে বড়ো-ছোটো সকল বস্তুই তার মালিকানার অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তায়ালা মানুষেরও মালিক। আমাদের জীবন-মৃত্যু তারই নিয়ন্ত্রণে। আমাদের ধনসম্পদ, সোনারুপা সবকিছুর প্রকৃত মালিকও তিনিই। পৃথিবীতে আমরা তার প্রতিনিধি। এ হিসেবে আমরা ধনসম্পদের আমানতদার মাত্র। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত ও পরকালের মালিক। জান্নাত-জাহান্নাম তারই অধিকারে। শেষ বিচারের দিনের মালিকও তিনিই। এক কথায় বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সবকিছুরই মালিক হলেন মহান আল্লাহ।

আল্লাহু কারিম (اَللّٰهُ كَرِيْمٌ)

কারিম আরবি শব্দ। এর অর্থ দয়াময়, মহানুভব, উদার ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা অতীব মহান, করুণাময়। উদারতা, দয়া, মায়া, স্নেহ, সহনশীলতা, ঔদার্য, ক্ষমা ইত্যাদি গুণাবলি পরিপূর্ণভাবে তার সত্তায় বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ অসীম

২০২১

তাই তার মায়া, ক্ষমা, সহনশীলতা ইত্যাদি সীমাহীন। আমাদের কেউ কাউকে দয়া দেখালে, ক্ষমা করলে, আমরা ঐ ব্যক্তিকে কতইনা মহান ভাবি। আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে তার গুণগান করি। কিন্তু মহান আল্লাহ যে কত বড় দয়াময়, উদার, ক্ষমাশীল তা আমরা অনুমানও করতে পারি না। কেননা তিনি তো মহামহিম অসীম সত্তার অধিকারী। তিনি সকল সৃষ্টির প্রতিই উদার ও মহানুভব। আলো, বাতাস, পানি, চন্দ্র, সূর্য, জীবজন্তু, পাহাড়, নদী, আসমান জমিন সবই আল্লাহর নিয়ামত। বিনিময় প্রত্যাশা ছাড়া উদারভাবে অকাতরে তিনি সকলের প্রতি নিয়ামত বিতরণ করেন। তার মহানুভবতার কোনো সীমা নেই। তার এ অসীম এবং অফুরন্ত দয়া, মায়া ও উদারতার জন্য সকলকে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, শোকর আদায় করা উচিত।

মহান আল্লাহর গুণবাচক নামের অনুসরণে আমরাও অন্যের প্রতি উদার ও দয়াপূর্ণ আচরণ করব। কথায়, কাজে বাস্তব জীবনে মহানুভব হবো।

আল্লাহু আলিম (اَللّٰهُ عَلِيْمٌ)

আলিম আরবি শব্দ। এর অর্থ সর্বজ্ঞ অর্থাৎ যিনি সবকিছু জানেন বা যিনি সকল জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা হলেন আলিম। তিনি সকল জ্ঞানের আধার, তার জ্ঞান অসীম। তার জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় না। কোনো কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি আসমান জমিনের সবকিছুর খবরই জানেন। আমাদের সকল কথাবার্তা, কাজকর্ম তিনি জানেন। এমনকি আমরা অন্তরে যা চিন্তা করি তিনি সেগুলোও জানেন। আমরা যা কল্পনা করি বা স্বপ্ন দেখি সেগুলোও তার জানার বাইরে নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন—

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

অর্থ : " অন্তরে যা আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৪)

আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান সীমাহীন। তার জ্ঞানকে কেউই ফাঁকি দিতে পারে না। ক্ষুদ্র পিপীলিকার সমস্ত খবরও তার জানা। সমুদ্রের তলদেশে কিংবা মহাশূন্যে কোথায় কী হচ্ছে সবই তিনি জানেন। মোটকথা সবই তার জ্ঞানের আওতাধীন। সুতরাং আমরা সবসময় এ কথা মনে রাখব। আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন এমন কোনো কাজ করব না।

আল্লাহু হাকিম (اَللّٰهُ حَكِيْمٌ)

হাকিম আরবি শব্দ। এর অর্থ প্রজ্ঞাময়, হিকমতের অধিকারী, সুবিজ্ঞ, সুনিপুণ কর্মদক্ষ। মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম হিসেবে হাকিম অর্থ আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়, সুদক্ষ, সুনিপুণ ও হিকমতের মালিক। এই মহাবিশ্ব তিনি যেমন সর্বোত্তম দক্ষতার সাথে সৃজন করেছেন, তেমন মহা প্রজ্ঞা, সুনিপুণ ও সুদক্ষ কৌশলের সাথে আবহমানকাল থেকে পরিচালনা করছেন। আকাশের তারকারাজি, চন্দ্র, সূর্য, মেঘমালা, নদনদী, আলো, বাতাস, আগুন, পানি, ফুল, ফল, বৃক্ষ-লতা, আসমান-জমিন, জীবনমরণ, স্বাদ-গন্ধ ও রূপ-রস যে দিকেই আমরা তাকাই সর্বত্রই এক সুন্দর সুনিপুণ কৌশল দেখতে পাই। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন,

"যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না; তুমি আবার তাকিয়ে দেখো, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি?" (সূরা আল-মুল্‌ক, আয়াত : ৩)

মহান আল্লাহর মহা প্রজ্ঞার নিদর্শন দেখে আমরা তার প্রতি সুদৃঢ় ইমান আনব, শ্রদ্ধায় বিনম্রভাবে তাকে স্মরণ করব। সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে যে প্রজ্ঞা ও হিকমত বিদ্যমান তা উপলব্ধি করে নিজেরা চিন্তাশীল হবো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় উৎসাহী হবো। খাঁটি ইমানদার হওয়ার পাশাপাশি অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানমনস্ক হবো। আমাদের লেখাপড়া ও দৈনন্দিন কাজকর্ম গুছিয়ে সুশৃঙ্খল-সুনিপুণভাবে সময়ানুবর্তী হয়ে সমাপন করতে চেষ্টা করব। তাতে আমাদের জীবন সার্থক ও সফল হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আল্লাহর চারটি গুণবাচক নাম উল্লেখ করে প্রত্যেকটির একটি করে শিক্ষা লিখে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৬
রিসালাত (اَلرِّسَالَةُ)

রিসালাত শব্দটি আরবি। এর অর্থ বার্তা, খবর, চিঠি বা সংবাদ বহন। রাসুলগণ যে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেন তাকে বলা হয় রিসালাত। আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসুলগণকে নানা দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যেমন : মানুষকে আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বান করা, সত্য দীন প্রচার করা, সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা, মহান আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি। রাসুলগণের এ সকল দায়িত্বকে এক কথায় রিসালাত বলা হয়।

ইসলামি আকিদায় তাওহিদের পরই রিসালাতের স্থান। এক্ষেত্রে নবুয়ত ও রিসালাত প্রায় সমার্থক।

নবি-রাসুলগণের পরিচয়

নবি-রাসুলগণ হলেন মহান আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বা মনোনীত বান্দা। নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তয়ালা তাঁদের নির্বাচিত করেছেন। যিনি নবুয়তের দায়িত্ব পালন করেন তিনি হলেন নবি। আর রিসালাতের দায়িত্ব পালনকারীকে বলা হয় রাসুল।

নবি-রাসুলগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ। তাঁরা কেউ আল্লাহর অংশ বা আল্লাহ তায়ালার পুত্র ছিলেন না। বরং মানুষের মধ্য থেকেই আল্লাহ পাক তাঁদের নির্বাচন করেছেন। তাঁরা বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা মা'সুম বা নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁরা সর্বদা নেক ও ভালো কাজ করতেন। অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকতেন। তাঁরা উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

নবি-রাসুলগণ মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরেন। তাঁরা মানুষকে মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেন। মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের শিক্ষা দিতেন। তাঁরা মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার বাণী ও বিধান পৌঁছে দিতেন। আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে মানুষকে হাতেকলমে শিক্ষা দিতেন। তাঁরা সবসময় মানুষের কল্যাণ কামনা করতেন।

নবি-রাসুলের পার্থক্য

নবি ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যাঁদের নিকট আসমানি কিতাব এসেছিল তাঁরা ছিলেন রাসুল। আর যাঁদের নিকট কোনো আসমানি কিতাব আসেনি তাঁরা হলেন নবি। নবিরা পূর্ববর্তী রাসুলের প্রচারিত দীন (ধর্ম) প্রচার করতেন। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে অনেক নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। পৃথিবীর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই নবি-রাসুল এসেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

অর্থ: অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি যাদের কথা ইতোপূর্বে অপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি যাদের কথা আপনাকে বলিনি।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৪)

কুরআন মাজিদ বা কোনো নির্ভরযোগ্য হাদিসে তাঁদের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি। এক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস রাখব, আল্লাহ তায়ালা যত নবি রাসুল পাঠিয়েছেন আমরা সবার ওপর ইমান রাখি। সর্বপ্রথম নবি ছিলেন হযরত আদম (আ.)। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। তাঁর পর দুনিয়াতে আর কোনো নবি আসেননি, আসবেনও না।

নবি-রাসুল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা

মহান আল্লাহ নানা কারণে মানুষের মধ্যে নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। নিম্নে এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো :

- নবি-রাসুলগণ মানুষকে আল্লাহ পাকের পরিচয় জানিয়েছেন।
- তাঁরা আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ও সত্য দীনের প্রতি আহবান করতেন।
- ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির পার্থক্য নবি-রাসুলগণই শিক্ষা দিতেন।
- তাঁরা মানুষকে উন্নত ও উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিতেন।
- তাঁরা মানুষকে জান্নাতে যাওয়ার পথ দেখাতেন। কীভাবে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা যায় সে শিক্ষা দিতেন।
- তাঁরা মানুষের নিকট আসমানি কিতাবসমূহের বাণী পৌঁছে দিতেন।
- হাতেকলমে মানুষকে আল্লাহ তায়ালার বিধান শিক্ষা দিতেন।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

রিসালাতে বিশ্বাস করার গুরুত্ব অপরিসীম। তাওহিদের পরই রিসালাতের স্থান। রিসালাতে অর্থাৎ নবি-রাসুলগণকে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারে না। কেননা নবি-রাসুলগণই আমাদের আল্লাহ তায়ালার পরিচয় জানিয়েছেন। তার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস না করলে আল্লাহ তায়ালা ও তার বাণীকে অস্বীকার করা হয়। অতএব, ইমানের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

নবি-রাসুলগণ ছিলেন আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা ও প্রেরিত মানব। মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁদের প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহর প্রেরিত সব নবি-রাসুলের প্রতি আমরা ইমান আনব। তাঁদের আনীত বাণীকে সম্মান করব। আর সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দেখানো পথে আমাদের জীবন পরিচালনা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা নবি-রাসুল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা খাতায় লিখে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

আখিরাত (اَلْاٰخِرَةُ)

আখিরাত অর্থ পরকাল। মানুষের দুনিয়ার জীবনকে বলা হয় ইহকাল। আর ইহকালের পরের জীবনই হলো পরকাল। আরবিতে একে বলা হয় আখিরাত। মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বলা হয় আখিরাত। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। আখিরাতে মানুষ জান্নাতের শান্তি বা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের পরপরই আমাদেরকে আখিরাতে বিশ্বাস করতে হবে। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারবে না। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে চরিত্রবান ও সৎকর্মশীল করে তোলে। কেননা যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে, সে জানে আখিরাতে মানুষকে দুনিয়ার কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে। সেখানে দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে সে পুরস্কার লাভ করবে। তার স্থান হবে চিরশান্তির জান্নাত। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পাপ ও অন্যায় কাজ করবে সে আখিরাতে শাস্তি ভোগ করবে। সে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস করলে মানুষ ভালো কাজ করতে উৎসাহিত হয়, মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করে।

বলা হয়ে থাকে, 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।' শস্যক্ষেত্রে মানুষ যেরূপ চাষাবাদ করে সেরূপ ফসল লাভ করে। যেমন কেউ ধান চাষ করলে ধান লাভ করে। গম চাষ করলে গম লাভ করে। তেমনি ভালো করে চাষাবাদ করলে ফসল বেশি লাভ করে। আর অলসতার কারণে চাষাবাদ না করে জমি ফেলে রাখলে সে কিছুই লাভ করে না। দুনিয়া ও আখিরাতের অবস্থাও ঠিক তেমন। আমরা যদি দুনিয়াতে ভালো কাজ করি, আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ মেনে চলি তাহলে আখিরাতে ভালো ফল লাভ করব। আর যদি নিজ ইচ্ছামতো চলাফেরা করি, অন্যায় ও পাপ কাজ করি তাহলে আমরা পরকালে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবো। সুতরাং পরকালের অনন্ত জীবনের জন্য দুনিয়াতেই আমাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

আখিরাতের পর্যায়সমূহ

আখিরাত বা পরকালের বেশ কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। যেমন: কবর, কিয়ামত ও হাশর।

কবর

পরকালীন জীবনের প্রথম ধাপ বা পর্যায় হলো কবর। একে 'আলমে বারযাখ'ও বলা হয়। মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে এ জীবনের শুরু হয়। এরপর কিয়ামত বা হাশর পর্যন্ত কবরের জীবন চলতে থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

অর্থ: আর তাদের সামনে বারযাখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত (সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত: ১০০)

মৃত্যুর পর মানুষকে কাফন পরিয়ে কবরে রাখা হয়। এ সময় কবরে দুইজন ফেরেশতা আগমন করেন। তাঁদের নাম মুনকার-নাকির। তাঁরা মৃত ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করেন। এগুলো হলো— তোমার রব কে? তোমার দীন কী? এবং তোমার নবি কে? যেসব লোকের কবর দেওয়া হয় না তারাও এ প্রশ্ন থেকে রেহাই পায় না।

দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করে এবং রাসুলের নির্দেশ মেনে চলে তারা এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারবে। তাদের কবর হবে শান্তিময়। আর যারা দুনিয়াতে ঈমান আনেনি, দীন মেনে চলেনি তারা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তারা সে সময় শুধু আফসোস করবে। কবরের জীবন তাদের জন্য হবে অতি কষ্টদায়ক।

কিয়ামত

কিয়ামত অর্থ মহাপ্রলয়। পৃথিবীতে এমন একসময় আসবে যখন মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে যাবে। দুনিয়াতে আল্লাহ বলার মতো কোনো লোক থাকবে না। সে সময় আল্লাহ পাক দুনিয়া ধ্বংস করে দেবেন। তাঁর নির্দেশে হযরত ইসরাফিল (আ.) শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। ফলে মহাপ্রলয় ঘটবে। এ দুনিয়ায় যা কিছু আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। পাহাড়,পর্বত তুলার ন্যায় আকাশে উড়তে থাকবে। পৃথিবীর নিচের সমুদয় ধনসম্পদ বের হয়ে আসবে। সবকিছু উলট-পালট হয়ে যাবে। কোনো প্রাণী বা বস্তু অবশিষ্ট থাকবে না। কেবল আল্লাহ তায়ালা থাকবেন। তিনি ব্যতীত আর কেউ বিরাজমান থাকবে না। এ অবস্থাকেই বলা হয় কিয়ামত বা মহাপ্রলয়।

হাশর

হাশর শব্দের অর্থ সমাবেশ, ভিড়, চাপ ইত্যাদি। কিয়ামতের পর বহুকাল একমাত্র আল্লাহ পাক বিদ্যমান থাকবেন। অতঃপর তিনি পুনরায় সমস্ত প্রাণীকে জীবিত করবেন। তার হুকুমে হযরত ইসরাফিল (আ.) দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। ফলে সকল প্রাণী পুনরায় জীবিত হবে। একে বলা হয় মৃত্যুর পর পুনরুত্থান। এ সময় একজন ফেরেশতা সবাইকে আহ্বান করবেন। ফলে সকলে একটি বিশাল ময়দানে সমবেত হবে। একে বলা হয় হাশর। আল্লাহ তায়ালা এখানে সকলের পাপপুণ্যের হিসাব নেবেন। সকল মানুষকে সে সময় আল্লাহ তায়ালার সামনে জবাবদিহি করতে হবে। সেদিন সূর্য মাথার অতি নিকটে থাকবে। প্রচণ্ড গরমে মানুষ ঘামতে থাকবে। এমনকি অনেকে ঘামের মধ্যে সাঁতার কাটবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আরশের ছায়া ব্যতীত সেদিন অন্য কোনো ছায়া তথা আশ্রয়স্থল থাকবে না। ইমানদার পুণ্যবানগণ সেদিন আরশের ছায়াতলে স্থান লাভ করবেন। তাঁদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। আমলনামায় দুনিয়ার জীবনের সকল পাপপুণ্যের হিসাব লেখা থাকবে। পাপীরা বাম হাতে আমলনামা পাবে। এরপর আল্লাহ পাক মহাবিচার শুরু করবেন। এটিই হলো শেষ বিচারের দিন। এদিন মহান আল্লাহ হবেন একমাত্র বিচারক। নবি-রাসুল ও ফেরেশতাগণ এদিন সাক্ষী হবেন। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোও এদিন সাক্ষ্য দান করবে। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এদিন তাঁর উম্মতদের জন্য সুপারিশ (শাফাআত) করবেন।

হাশরের ময়দানে মানুষের পাপপুণ্যের ওজন করা হবে। এটি সম্পন্ন হবে মিযান-এর মাধ্যমে। মিযান হলো পরিমাপক যন্ত্র। যাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাঁরা জান্নাতের নানারকম নিয়ামত ভোগ করবেন। সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই পাবে। যাদের মিযানে পাপের পাল্লা ভারী হবে তারা হবে জাহান্নামী। জাহান্নাম হলো ভীষণ কষ্টের স্থান। সেখানে তারা আগুনে দগ্ধ হবে। তবে কখনো মারা যাবে না। বরং কষ্ট ভোগ করতে থাকবে।

মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনই হলো আখিরাত। সেখানে মানুষের পাপপুণ্যের হিসাব নেওয়া হবে। পুণ্যবানগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর পাপীরা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। সুতরাং আমরা দুনিয়াতে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস করব। আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ মেনে চলব। ন্যায় ও সৎকাজ করব। তবেই পরকালে চিরশান্তির জান্নাত লাভ করতে পারব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আখিরাতের স্তরসমূহের একটি ধারাবাহিক তালিকা তৈরি করবে।

২০২৫

পাঠ ৮
আকাইদ ও নৈতিকতা

ইসলামের মূল বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নামই আকাইদ। যেমন: তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি। আর নৈতিকতা হলো নীতির অনুশীলন। অর্থাৎ কথা ও কাজে উত্তম রীতিনীতির অনুশীলন করা, মার্জিত ও বিনয়ী হওয়া, উত্তম চরিত্রবান হওয়া ইত্যাদি। অন্যায়, অশ্লীল ও অশালীন বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করাও নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত।

নৈতিকতা ও নীতির অনুসরণ মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। নীতিহীন মানুষ পশুর সমান। পশুর কোনোরূপ নীতিবোধ নেই। সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। ভালোমন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ কোনো কিছুরই সে পরোয়া করে না। সে শুধু নিজের লাভ ও কল্যাণই বোঝে। নীতিহীন মানুষও ঠিক তেমনি। সে কোনোরূপ আইনকানুন, বিধিবিধান মানে না। সে নৈতিক আচরণ পালন করে না। বরং নিজের লাভের জন্য সে অপরের ক্ষতিসাধন করে থাকে। মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা দেওয়া, পরচর্চা ইত্যাদি তার চরিত্রে ফুটে ওঠে। সমাজে সে নানারূপ অশান্তি সৃষ্টি করে। ফলে সমাজের কেউই তাকে বিশ্বাস করে না। কোনো মানুষই তাকে ভালোবাসে না।

অন্যদিকে নৈতিকতা মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে। নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ সমাজে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করে। সকলেই তাঁকে সম্মান করে।

আকাইদ ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আকাইদ বা ইসলামি বিশ্বাসসমূহ মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। যে ব্যক্তি আকাইদের বিষয়গুলো ভালোভাবে বিশ্বাস করে তার চরিত্র সুন্দর হয়। সে সবসময় নীতি ও উত্তম আদর্শের অনুসরণ করে। অন্যায়, অত্যাচার, অশ্লীলতা থেকে সে সর্বদা দূরে থাকে। সে কখনো দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। বরং সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধে সে সচেষ্ট হয়।

আকাইদের প্রথম বিষয় হলো তাওহিদ। তাওহিদ হলো একত্ববাদ। আল্লাহ্ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা। তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা ও মালিক। তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী ইত্যাদি বিশ্বাস করা। তাওহিদে এরূপ বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনো অনৈতিক কাজ করতে পারে না। কেননা সে জানে যে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন। তিনি তাকে সর্বদা দেখছেন এবং তার সকল কাজের হিসাব রাখছেন। সুতরাং সে সর্বদা আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমমতো জীবনযাপন করে। অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে।

তাওহিদের পরই আসে রিসালাত। রিসালাত হলো নবি-রাসুলগণের উপর বিশ্বাস। তাঁরা আল্লাহ্ তায়ালার মনোনীত বান্দা। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠজন। তাঁরা নিষ্পাপ ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। সুতরাং রিসালাতে বিশ্বাসী মানুষ নবি-রাসুলগণের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাঁদের ন্যায় সেও উত্তম চরিত্র অনুশীলন করে। উদ্ধত ও অশালীন চলাফেরা ও কথাবার্তা তার থেকে কখনো প্রকাশ পায় না।

আখিরাতে বিশ্বাস আকাইদের অন্যতম অংশ। আখিরাত হলো পরকাল। মানুষের এ দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। বরং মৃত্যুর সাথে সাথে আরেক জীবনের শুরু হবে। এরই নাম আখিরাত। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এ জীবন অনন্ত ও চিরস্থায়ী। আখিরাতে মানুষের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। দুনিয়াতে যে ভালো ও নেক কাজ করবে আখিরাতে সে চিরশান্তির জান্নাত লাভ করবে। আর দুনিয়ায় যে অন্যায় ও পাপ কাজ করবে আখিরাতে সে চরম শাস্তির মুখোমুখি হবে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়ার জীবনে ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করে। আখিরাতের সফলতা ও শান্তির আশায় মানুষ ভালো কাজ করে, সকলের সাথে মিলেমিশে চলে এবং উত্তম চরিত্রবান হয়। অন্যদিকে আখিরাতের শাস্তির ভয়ে মানুষ মন্দ ও অশ্লীল কাজ পরিত্যাগ করে। অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে। এভাবে মানুষ আখিরাতে বিশ্বাসের ফলে নৈতিকতা অনুশীলন করে থাকে।

অতএব, নৈতিকতা অর্জনে আকাইদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ভালোভাবে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস করব। দুনিয়াতে নৈতিকতার অনুশীলন করব, অনৈতিক কাজকে কখনোই পছন্দ করব না। তাহলে আমরা ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভ করব।

কাজ : শ্রেণির সব শিক্ষার্থী মিলে তাদের মধ্য থেকে চারজন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করবে। তারা প্রত্যেকে এই পাঠ থেকে কী শিক্ষা পেলো তা আলোচনা করবে আর অন্য সব শিক্ষার্থী শুনবে। পরিশেষে সবাই মিলে একটি তালিকা তৈরি করবে।

নতুন শব্দাবলি

ইলাহ – মাবুদ, উপাস্য।

মাবুদ – ইবাদতের যোগ্য/ অধিকারী। যাঁর ইবাদত করা হয়।

লা-শারিক – যাঁর কোনো অংশীদার নেই।

দীন – ধর্ম, জীবন বিধান।

আরশ – আল্লাহ তায়ালার আসন।

উম্মত – অনুসারী বা দল। যেমন : আমরা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মত; দল।

দাওয়াত – আহ্বান। আল্লাহ তায়ালা ও দীন ইসলামের দিকে আহবানকে দাওয়াত বলা হয়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১। কালিমা তায়্যিবা অর্থ হলো .... ।

২। কালিমা শাহাদাত ইমানের অন্যতম .... বাক্য ।

৩। ইমান মুজমাল অর্থ সংক্ষিপ্ত .... ।

৪। আল্লাহ তায়ালা সকল গুণের .... ।

৫। ইসলামি আকিদায় তাওহিদের পরই .... স্থান ।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১। কালিমা তায়্যিবা	বলা হয় রাসুল ।
২। আল্লাহর গুণবাচক নাম আল্লাহর	নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন ।
৩। রিসালাতের দায়িত্ব পালনকারীকে	ইমানের মূলভিত্তি ।
৪। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে অনেক	শ্রেষ্ঠ সন্তান ।
৫। নবি-রাসুলগণ ছিলেন মানবজাতির	পরিচয় প্রকাশ করে ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। ইমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ।

২। আল্লাহর গুণবাচক নাম 'কারিমুন'-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখ ।

৩। হাশর বলতে কী বোঝ ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। রিসালাতের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর ।

২। 'আখিরাতে বিশ্বাস নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটায়' – ব্যাখ্যা কর ।

৩। নৈতিকতা উন্নয়নে আকাইদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মুজমাল শব্দের অর্থ কী?

ক. বিশ্বাস খ. বাক্য
গ. সংক্ষিপ্ত ঘ. বিস্তারিত

২। রিসালাতে বিশ্বাস মানুষকে–

i. সমাজে শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত করে
ii. আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানতে সাহায্য করে
iii. সত্যবাদী হতে উদ্বুদ্ধ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রেবেকা তাবাসসুম ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী। সে ভাবে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও সময়ে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র পৃথিবীতে দৃশ্যমান হয় এবং আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। কখনো এর ব্যতিক্রম সে লক্ষ করেনি। সে তার বান্ধবীর সাথে আলাপের সময় বলল যে, আল্লাহ যদি এক না হয়ে একাধিক হতেন তবে একদিন না একদিন নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে কোনো কিছু ঘটত। সেটি কখনো ঘটেনি। আল্লাহ যে এক ও অদ্বিতীয় এটি তার বড় প্রমাণ।

৩। রেবেকার চিন্তায় ইসলামের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?

ক. তাওহিদ খ. রিসালাত
গ. আখিরাত ঘ. ইমান মুজমাল

৪। উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির কারণেই আল্লাহ তায়ালা–

i. রিজিকদাতা ও পালনকর্তা
ii. রক্ষাকর্তা ও শাস্তিদাতা
iii. চিরঞ্জীব ও শাশ্বত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মেজবাহ এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে মামার বাড়ি বেড়াতে গেল। মামা তাকে নিয়ে খুলনার সুন্দরবন বেড়াতে গেল। সুন্দরবনের গাছগাছালি ও সমুদ্রতীরের মনোরম দৃশ্যাবলি দেখে সে মুগ্ধ হলো এবং মামাকে বলল কী চমৎকার সৃষ্টি! সে মামাকে প্রশ্ন করল, 'মামা এসব কী আল্লাহর সৃষ্টি, নাকি প্রকৃতির সৃষ্টি?' মামা তাকে বুঝিয়ে বলল যে, 'এ পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র এবং এসব গাছগাছালি, জলপ্রপাত, সমুদ্রের জলরাশি সবই তার সৃষ্টি।'

ক. কালিমা তাইয়্যিবার অর্থ লেখ।

খ. রিসালাত বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. মামার নিকট মেজবাহর প্রশ্নটি আকাইদের কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মেজবাহর মামার উত্তরটির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

২। মাহমুদা ও শাহিদা দুইজন খুবই ভালো বন্ধু। একদিন কথা প্রসঙ্গে মাহমুদা বলল, 'দেখ শাহিদা সূর্য প্রতিদিন একই নিয়মে উঠছে, দিন শেষে আবার রাত হচ্ছে। এতে কোনো রকম ব্যতিক্রম নেই। এগুলো কিন্তু আল্লাহর ইশারাতেই হচ্ছে।' উত্তরে শাহিদা বলল, 'এছাড়া আল্লাহ তায়ালা দীন প্রচার করা, সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা, অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি কাজের জন্য যুগে যুগে নবি-রাসুলগণকে প্রেরণ করেন।'

ক. আখিরাতের অর্থ কী?

খ. নৈতিকতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. মাহমুদা কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছে তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাহমুদার কথায় বিশ্বাস স্থাপন এবং শাহিদার কথার অনুশীলনই মানবকল্যাণ নিশ্চিত করে– বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ)

আল্লাহ্ তায়ালার দাসত্ব স্বীকার করাকে ইবাদত বলে। আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ, বিধিবিধান মেনে চলার নামই ইবাদত। পরকালের শান্তির জন্য মানুষ সালাত, সাওম ইত্যাদি পালন করে থাকে। দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজ বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- ইবাদতের ধারণা, তাৎপর্য ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণা ও পবিত্র থাকার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- পবিত্র হওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- সালাত (নামায) আদায়ের নিয়মকানুন, সময়সূচি ও সালাতের ফরজ, ওয়াজিব ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- সালাত (নামায) ভঙ্গের কারণ বর্ণনা করতে পারব।
- সিজদাহ্ সাহু ও সিজদাহ্ তিলাওয়াতের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- বাস্তব জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা ও সাম্যের শিক্ষা অর্জনে সালাতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ ১
ইবাদতের ধারণা ও তাৎপর্য

ইবাদত (عِبَادَةٌ) আরবি শব্দ। এর অর্থ আনুগত্য করা। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যই হলো ইবাদত। ইসলামি পরিভাষায়-আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নামই ইবাদত। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ, ইত্যাদি যেমন ইবাদত, তেমনি জীবনের প্রতিটি কাজ ইসলামি বিধিবিধান অনুযায়ী পালন করাও ইবাদত।

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের লালনপালন করেন। তিনিই আমাদের রব। আমরা তার বান্দা। আমাদের জীবনমরণ তার হাতে। তিনি আমাদের জন্য এ মহাবিশ্বকে কত সুন্দর করে সাজিয়েছেন। আসমান জমিন, চাঁদ, সুরুজ, ফুল, ফল, নদীনালা সব আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমরা সব ভোগ করি। আমাদের সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তৈরি করেছেন। আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করার পর এর শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করতে হবে। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহর দেওয়া বিধানমতো চলার নামই ইবাদত। আমরা আল্লাহর আদেশমতো চলব এবং তারই ইবাদত করব।

মহান আল্লাহ সকল জিনিস মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত বা দাসত্ব স্বীকার করার জন্য। এ সম্পর্কে কুরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○

অর্থ : "আর আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয্-যারিয়াত, আয়াত : ৫৬)

মহানবি (স.) ইবাদত সম্পর্কে বলেছেন, 'যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করে চল। আর কখনো কোনো মন্দ কাজ হয়ে গেলে তখনি একটি ভালো কাজ করে ফেল। তাহলে এ কাজটি পূর্ববর্তী মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেবে। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর।' (তিরমিযি)

আমরা ভালো কাজ করব। অন্যকে সৎকাজের পরামর্শ দেবো। এতে উভয়ই সমান সাওয়াব পাব। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পরামর্শ বা সন্ধান দেবে, সে ঐ কাজটি সম্পাদনকারীর সমান সাওয়াব পাবে।' (মুসলিম)। আমাদের জন্য নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি কতগুলো নির্ধারিত ইবাদত রয়েছে। এগুলো নবি করিম (স.) যেভাবে আদায় করেছেন, আমাদেরকে করতে বলেছেন, আমরা ঠিক সেভাবেই আদায় করব। এভাবে মানুষ তার জীবনকে পরিচালিত করলে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি বৃদ্ধি পাবে।

ইবাদতের প্রকারভেদ

ইবাদতকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : ১. ইবাদতে বাদানি বা শারীরিক ইবাদত, ২. ইবাদতে মালি বা আর্থিক ইবাদত, ৩. ইবাদতে মালি ও বাদানি বা শরীর ও অর্থ উভয়ের সংমিশ্রণে ইবাদত। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে যে ইবাদত করা হয় তাকে বলা হয় ইবাদতে বাদানি বা শারীরিক ইবাদত। যথা- দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ও রমযান মাসে রোযা রাখা। ইবাদতের মধ্যে শারীরিক ইবাদত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থের দ্বারা যে ইবাদত করতে হয় সেগুলোকে বলা হয় ইবাদতে মালি বা আর্থিক ইবাদত। যেমন: যাকাত দেওয়া, সাদাকা ও দানখয়রাত করা ইত্যাদি। উল্লিখিত দুই প্রকার ইবাদত ছাড়াও এমন কিছু ইবাদত আছে যা শুধু শরীর দ্বারা কিংবা অর্থ দ্বারা করা যায় না। বরং শরীর এবং অর্থ উভয়ের প্রয়োজন হয়; যেমন: হজ করা, জিহাদ করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তায়ালা যেহেতু আমাদের ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, তাই সবসময় তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকা আমাদের কর্তব্য। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সবসময় কি ইবাদত করা সম্ভব? হ্যাঁ, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ইবাদত করা সম্ভব। যেমন আমরা খেতে বসলে যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করি, তবে যতক্ষণ খাওয়ার মধ্যে থাকব ততক্ষণ আল্লাহর রহমত পেতে থাকব। এটিই ইবাদত। পড়ার সময় যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে পড়া শুরু করি তবে যতক্ষণ পর্যন্ত লেখাপড়া করব, ততক্ষণই তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। স্কুলে যাবার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে যাত্রা শুরু করলে রাস্তার সকল বিপদাপদ থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন। একজন অন্ধলোক রাস্তা পার হতে পারছে না, তাকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিলে তাও আল্লাহর নিকট ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে সবসময় আমরা ইবাদতে মশগুল থাকতে পারি। ইবাদত করলে আল্লাহ খুশি হন। এতে দুনিয়ার জীবন সুখময় হয়। পরকালে পরম শান্তিময় স্থান জান্নাত লাভ করা যায়। আর যারা ইবাদত করে না, আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে না, আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তারা দুনিয়াতে শান্তি পায় না। পরকালেও তাদেরকে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পাঠ্যপুস্তকের আলোচনার বাইরে আর কোন কোন কাজ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তার তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ২
নাজাসাত (اَلنَّجَاسَةُ)

'নাজাসাত' আরবি শব্দ। এর অর্থ অপবিত্রতা। এটি তাহারাত বা পবিত্রতার বিপরীত। শরীর থেকে যেসব জিনিস বের হওয়ার কারণে শরীর অপবিত্র হয়ে যায় অথবা যে সব দ্রব্য কোনো পবিত্র বস্তুতে লাগলে তা অপবিত্র হয়ে যায়, তাকে নাজাসাত বা অপবিত্রতা বলা হয়। যেমন: মল-মূত্র, রক্ত ইত্যাদি। নাজাসাতের কারণে শরীর, কাপড় ও ব্যবহারিক জিনিসপত্র অপবিত্র হয়ে যায়। এ অবস্থায় তা পবিত্র করা একান্ত জরুরি।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

অর্থ: আর তোমরা যদি অপবিত্র হয়ে যাও তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৬)

নাজাসাত বা অপবিত্রতার প্রকারভেদ

নাজাসাত দুই প্রকার:

১. নাজাসাতে হাকিকি বা প্রকৃত অপবিত্রতা
২. নাজাসাতে হুকমি বা অপ্রকৃত অপবিত্রতা

নাজাসাতে হাকিকি: নাজাসাতে হাকিকি বলতে ঐ সকল অপবিত্র বস্তুকে বোঝায় যেগুলো প্রকৃতিগতভাবেই অপবিত্র এবং ইসলামি শরিয়ত সেগুলোকে অপবিত্র ঘোষণা করে। ঐ সকল অপবিত্র বস্তুকে মানুষ অপছন্দ করে। যেমন: প্রস্রাব, পায়খানা, রক্ত ইত্যাদি। ইসলাম এসব থেকে শরীরকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

নাজাসাতে হুকমি: নাজাসাতে হুকমি হচ্ছে ঐ সকল অপবিত্রতা যা দেখা যায় না কিন্তু ইসলামি বিধানে তা নাজাসাত বা অপবিত্র বলে গণ্য। যেমন-ওযু ভঙ্গ হওয়া, গোসলের প্রয়োজন হওয়া ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, উভয় প্রকার অপবিত্রতা থেকে শরীর পবিত্র রাখা একান্ত প্রয়োজন।

অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপায়সমূহ

আল্লাহ তায়ালা নিজে পবিত্র, তাই তিনি পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যক্তি ও পবিত্র বস্তুকে পছন্দ করেন। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার পবিত্রতা অর্জন করা জরুরি। ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী পবিত্রতা অর্জনের উপায়গুলো হলো-

১. **ওযু:** শরীর পবিত্র করার নিয়তে পাক-পবিত্র পানি দিয়ে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী মুখমণ্ডল, দুই হাত (কনুই সহ) ও দুই পা (টাখনু সহ) ধৌত করা এবং মাথা মাসহ করার নাম ওযু। যে পানি দিয়ে ওযু করা হবে তা অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। যেমন-নদী, খাল, পুকুর, কূপ, ঝরনা, নলকূপ বা শহরে সরবরাহ করা পানি।

২. **গোসল:** পবিত্র পানি দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে পুরো শরীর ধৌত করাকে গোসল বলে। গোসলের মাধ্যমে পুরো শরীর পবিত্র হয়ে যায়।

৩. **তায়াম্মুম:** পানি পাওয়া না গেলে অথবা অসুস্থ অবস্থায় রোগী পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসহ করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করাকে তায়াম্মুম বলে।

ইসলাম মনের পবিত্রতার ওপর খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। খ্যাতিমান ইসলামি পণ্ডিতগণ মনের কতিপয় মৌলিক রোগ চিহ্নিত করেছেন। তা হলো লোভ, উচ্চাশা, রাগ, মিথ্যা বলা, গিবত (পরনিন্দা), কার্পণ্য, অহংকার, রিয়া (লোক দেখানো), হাসাদ (হিংসা)। এ পাপগুলো থেকে বেঁচে থাকলে মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। এ ছাড়া ইসলামের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলো যথাযথভাবে আদায়ের মাধ্যমে মনের পবিত্রতা অর্জন করা যায়। কোনো মুমিন যদি ইবাদাতের পাশাপাশি হালাল খাদ্য গ্রহণ করেন, হারাম থেকে বেঁচে থাকেন, কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং সদা আল্লাহর যিকির (স্মরণ) করেন তবে তাঁর অন্তর পবিত্র থাকবে। এবার আমরা পবিত্র থাকার লক্ষ্যে ওযু, গোসল এবং তায়াম্মুমের নিয়মগুলো জেনে নেবো।

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা চার-পাঁচজনের দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক দল প্রকৃত অপ্রবিত্রতার ও অপ্রকৃত অপবিত্রতার একটি তালিকা ছক আকারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩
পবিত্রতা (اَلطَّهَارَةُ)

পবিত্রতার আরবি প্রতিশব্দ 'তাহারাতুন'। ওযু, গোসল ইত্যাদির মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। ইবাদতের জন্য পবিত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। পবিত্র না হয়ে নামায আদায় করা যায় না। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, 'পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল হয় না এবং আত্মসাতের মাল দ্বারা সাদাকা (দান) হয় না।' (মুসলিম)

পবিত্র থাকলে শরীর সুস্থ থাকে। মন প্রফুল্ল থাকে। লেখাপড়া ও কাজকর্মে মন বসে। আল্লাহ তায়ালাও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ○

অর্থ : "আর উত্তমরূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন।" (সূরা আত্-তাওবা, আয়াত : ১০৮)

রাসুলুল্লাহ (স.) স্বয়ং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি তাঁর উম্মতকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন এবং পবিত্র থাকার জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, 'পবিত্রতা ইমানের অংশ।' (মুসলিম)

পবিত্রতার প্রকারভেদ

পবিত্রতা দুই প্রকার : ১. অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, ২. বাহ্যিক পবিত্রতা।

অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা

হৃদয়কে যাবতীয় শিরক, রিয়া, গিবত ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখার নাম অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা।

বাহ্যিক পবিত্রতা

শরিয়তের বিধিমোতাবেক ওযু, গোসল ইত্যাদির মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনকে বাহ্যিক পবিত্রতা বলে।

পবিত্রতা ও অপবিত্রতার মানদণ্ড হচ্ছে শরিয়ত। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি বা অভিরুচি অনুযায়ী এ বিষয়ে কিছু কমবেশি করার কারো অধিকার নেই। কেবল সেসব বস্তুই পবিত্র যাকে শরিয়ত পবিত্র বলেছে। আর সেসব বস্তু অপবিত্র যাকে শরিয়ত অপবিত্র বলেছে। সুতরাং শরিয়তের বিধিমোতাবেক পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। নিজের ধ্যানধারণা ও রুচির বশীভূত হয়ে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার কোনো মানদণ্ড ঠিক করা উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

অর্থ : "আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো অসুবিধা রাখতে চান না। বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৬)

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে পবিত্র থাকার উপায়গুলো দলীয় আলোচনার পর পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

২০২৩

পাঠ ৪
ওযু (اَلْوُضُوْءُ)

ওযু আরবি শব্দ। এর অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, উজ্জ্বলতা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়– শরীর পবিত্র করার নিয়তে পবিত্র পানি দিয়ে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়ার নামই ওযু।

ওযুর গুরুত্ব

ওযুর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

"যারা ইমান এনেছ জেনে রেখো, যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াবে তার আগে নিজেদের মুখমণ্ডল ধুয়ে নেবে, তোমাদের দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নেবে, মাথা মাসেহ্ করবে এবং উভয় পা গিরাসহ ধুয়ে নেবে।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৬)

ভালোভাবে ওযু করলে মন প্রফুল্ল থাকে। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সতেজ থাকে। ইবাদতেও একাগ্রতা আসে। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, 'আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে চিনতে পারব।' জনৈক সাহাবি প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আপনি কীভাবে আমাদের চিনবেন?' নবি করিম (স.) উত্তরে বললেন, 'ওযুর ফলে আমার উম্মতের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা উজ্জ্বলতায় ঝক্ঝক্ করবে। তাতেই আমি আমার উম্মতকে চিনতে পারব।' (বুখারি ও মুসলিম)। কাজেই ওযুর ফজিলত বা মর্যাদা পাওয়ার আশায় আমাদের অতি উত্তমরূপে ওযু করতে হবে। ওযু পরিপূর্ণ হলে ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ের নামাযই পরিশুদ্ধ হয়। আর ওযু অপরিপূর্ণ হলে নামাযে পরিপূর্ণতা আসে না।

ওযুর নিয়ম

মনে মনে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে প্রথমে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে তিনবার কুলি করতে হবে। রোযা না থাকলে তিনবারই গড়গড়া করে কুলি করতে হবে। এরপর নাকে পানি দিয়ে তিনবার নাক পরিষ্কার করতে হবে। তারপর তিনবার সমস্ত মুখমণ্ডল এমনভাবে ধৌত করতে হবে যাতে চুল পরিমাণ স্থানও শুকনো না থাকে। দাড়ি ঘন হলে খিলাল করতে হবে। এরপর দুই হাত কনুইসহ ধৌত করতে হবে। হাতে ঘড়ি, আংটি ইত্যাদি থাকলে তা নাড়াচাড়া করতে হবে যেন সবখানে পানি পৌঁছে যায়। তারপর দুই হাত ভিজিয়ে মাথা এবং কান মাসেহ্ করতে হবে। মাসেহ্ করার সময় পুরো দুই হাত দিয়ে কপালের চুলের গোড়া থেকে পিছন দিকে ঘাড়সহ সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ্ করতে হবে। তারপর দুই হাতের তালু পিছন দিক থেকে সামনের দিকে টেনে সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ্ করতে হবে। মাসেহ্ করার পর দুই পা টাখনু-সহ ভালো করে ধৌত করতে হবে যাতে একটু জায়গাও বাকি না থাকে। ওযুর কাজগুলো পরপর করে যেতে হবে। অর্থাৎ এক অঙ্গের পর অন্য অঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে ধৌত করতে হবে। অনেকক্ষণ থেমে থেমে করা যাবে না।

২০২৫

ওযুর ফরজ

ওযুর ফরজ চারটি। এ চারটির মধ্যে কোনো একটি বাদ পড়লে ওযু হবে না।

১. মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা।

২. উভয় হাত কনুইসহ একবার ধোয়া।

৩. মাথার এক-চতুর্থাংশ একবার মাসেহ্ করা।

৪. উভয় পা গিরাসহ একবার ধোয়া।

ওযু ভঙ্গের কারণ

১. প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হলে।

২. প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়াও শরীরের যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো অপবিত্র বস্তু বের হয়ে গড়িয়ে গেলে (যেমন : রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি)।

৩. থুথু, কাশি ব্যতীত বমির সাথে রক্ত, পুঁজ, খাদ্য অথবা অন্য কিছু বের হলে এবং মুখভর্তি বমি হলে।

৪. থুথুর সাথে বেশি পরিমাণ রক্ত এলে।

৫. চিত হয়ে, কাত হয়ে অথবা হেলান দিয়ে ঘুমালে।

৬. বেহুশ হলে।

৭. পাগল হলে।

৮. নেশাগ্রস্ত হলে।

৯. নামাযে অট্টহাসি হাসলে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই শ্রেণিতে শিক্ষকের নির্দেশনায় ওযু করার উপকরণের মাধ্যমে অথবা প্রতীকী উপকরণের সাহায্যে ওযু করার নিয়ম অনুশীলন করবে।

পাঠ ৫
তায়াম্মুম (اَلتَّيَمُّمُ)

তায়াম্মুম আরবি শব্দ। এর অর্থ ইচ্ছা করা। ইসলামি পরিভাষায় পবিত্র মাটি বা ঐ জাতীয় পবিত্র বস্তু (যেমন : পাথর, চুনাপাথর, বালি ইত্যাদি) দ্বারা পবিত্র হওয়ার নিয়তে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ্ করাকে তায়াম্মুম বলে। তায়াম্মুম ওযু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তে করা যায়। তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার অনুমতি উম্মতে মুহাম্মাদির (স.) জন্য আল্লাহ্ তায়ালার এক বিশেষ অনুগ্রহ। বস্তুত পবিত্রতা অর্জনের প্রকৃত মাধ্যম হলো পানি। আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে পানি সরবরাহ করে রেখেছেন। তথাপি এমন অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে যে, পানি পাওয়া যাচ্ছে না অথবা পাওয়া গেলেও পানি ব্যবহারে রোগবৃদ্ধি বা প্রাণনাশের আশঙ্কা রয়েছে। এসব অবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালা মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "আর তোমরা যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ্ করবে। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৬)

তায়াম্মুমের ফরজ

তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি। যথা–

১. পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা।

২. পবিত্র মাটি দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ্ করা।

৩. উভয় হাত পবিত্র মাটি দিয়ে কনুইসহ মাসেহ্ করা।

তায়াম্মুম করার নিয়ম

প্রথমে নিয়ত করে 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম' পড়বে। তারপর দুই হাতের তালু একটু প্রসারিত করে পবিত্র মাটি বা ঐ জাতীয় পবিত্র বস্তু; যেমন: পাথর, চুনাপাথর, বালি ইত্যাদিতে দুই হাত লাগিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসেহ্ করবে। পুনরায় দুই হাত মাটিতে লাগিয়ে উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ্ করবে। হাতে কোনো ঘড়ি বা অন্য কোনো জিনিস থাকলে তা সরিয়ে তার নিচেও মাসেহ্ করতে হবে।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ

যেসব কারণে ওযু ভঙ্গ হয় সেসব কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়। যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয়, সেসব কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়। পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম ভেঙে যায়। কোনো রোগের কারণে তায়াম্মুম করা হলে, সে রোগ দূর হওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম ভেঙে যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই শ্রেণিতে শিক্ষকের নির্দেশনায় তায়াম্মুম করার পদ্ধতি অনুশীলন করবে।

পাঠ ৬
গোসল (اَلْغُسْلُ)

'গোসল' আরবি শব্দ। এর অর্থ ধৌত করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় পবিত্রতা অর্জন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা সমস্ত শরীর ধোয়াকে গোসল বলে।

গোসলের ফরজ

গোসলের ফরজ তিনটি। যথা–

১. গড়গড়া করে কুলি করা।

২. নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছানো।

৩. সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধোয়া।

গোসলের নিয়ম

প্রথমে ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ভালো করে ধৌত করতে হবে। তারপর শরীরের কোথাও অপবিত্র বস্তু লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে। এরপর ভালোভাবে ওযু করতে হবে। কুলি করার সময় কণ্ঠদেশে এবং নাকের ভিতরে পানি ভালো করে পৌঁছাতে হবে। ওযুর পর মাথায় এমনভাবে পানি ঢালতে হবে যেন চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। এরপর ডান কাঁধে তারপর বাম কাঁধে পানি ঢেলে সমস্ত শরীর ধৌত করতে হবে যেন শরীরের কোনো অংশ শুকনো না থাকে। সর্বশেষে পা ধুতে হবে। এরপর সমস্ত শরীর কোনো কাপড় বা গামছা দিয়ে মুছে শুকনো কাপড় পরতে হবে।

> **কাজ :** 'পবিত্র হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে গোসল।'
> এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে দলে ভাগ হয়ে বিতর্ক করবে।

২০২৫

পাঠ ৭

সালাত (اَلصَّلٰوةُ)

'সালাত' আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দোয়া, রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আরকান আহকামসহ বিশেষ নিয়ম ও নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর ইবাদতের নাম সালাত বা নামায। আল্লাহর নিকট বান্দার আনুগত্য প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে নামায। ইসলামের পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভের মধ্যে নামায দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রুকন। হাদিসে আছে, 'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত: এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) তার (আল্লাহ তায়ালার) বান্দা ও রাসুল, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, হজ করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা।' (বুখারি ও তিরমিযি)

পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

অর্থ: "এবং তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩)

নামায মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন মজিদে ঘোষণা করেন—

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

অর্থ: "নিশ্চয়ই নামায মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)

নামায আদায়কারী দুনিয়াতে মর্যাদা পাবে। আখিরাতে পাবে জান্নাত। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, 'নামায বেহেশতের চাবি।' কারো হাতে কোনো ঘরের চাবি থাকলে যেমন অতি সহজেই ঘরে প্রবেশ করতে পারে। তেমনি যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে সে অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। নামাযের মাধ্যমে মুমিনের গুনাহ মাফ হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'এ কথার মধ্যে তোমাদের কী মত? যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি প্রবাহিত নদী থাকে, যার মধ্যে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে। তাহলে তার দেহে কোনো ময়লা বাকি থাকবে কি?' সাহাবিগণ (রা.) বললেন, 'তার কোনো ময়লা বাকি থাকবে না।' তখন রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, 'এটাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ যা দ্বারা যাবতীয় গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়।' (বুখারি ও মুসলিম)

মহানবি (স.) আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে কিয়ামতের দিন তার জন্য নামায নুর, দলিল ও নাজাত হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে না কিয়ামতের দিন তার জন্য নামায নুর, দলিল ও নাজাত হবে না। তার হাশর হবে কারুণ, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খলফের সঙ্গে।' (আহমাদ ও দারিমি)

এছাড়াও নামাযের আরও কতিপয় গুরুত্ব রয়েছে যা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হলো :

- ইসলামে ইমানের পরই নামাযের স্থান।
- স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করা কুফর।
- নামায দীন ইসলামের খুঁটিস্বরূপ।
- মৃত্যুকালে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সর্বশেষ উপদেশ ছিল নামায ও নারীজাতি সম্পর্কে।

> **কাজ :** 'একজন মানুষ নামাযি হতে পরিবারই মুখ্য ভূমিকা রাখে' এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্ক করবে।

পাঠ ৮

সালাতের সময়সূচি (أَوْقَاتُ الصَّلٰوةِ)

যথাসময়ে নামায আদায় করা আল্লাহর আদেশ। সময়মতো নামায আদায় করা ফরজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

অর্থ : "নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১০৩)

সালাতের সময়

ফজর : ফজরের সালাতের সময় আরম্ভ হয় সুবহে সাদিকে হওয়ার সাথে সাথে এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। আকাশের পূর্ব দিগন্তে লম্বমান যে আলোর রেখা দেখা দেয় তাকেই বলে সুবহে সাদিক। আলো ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং শেষে সূর্যোদয় ঘটে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'সুবহে সাদিকের পর হতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত ফজর সালাতের সময়।' (মুসলিম)

যোহর : দ্বিপ্রহরের পর সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়লেই যোহরের সময় শুরু হয়। প্রত্যেক বস্তুর ছায়া 'ছায়া আসলি' বাদ দিয়ে দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত এই সময় থাকে। কোনো বস্তুর ঠিক দুপুরের সময়ে যে একটু ছায়া থাকে তাকেই 'ছায়া আসলি' বা আসল ছায়া বলে। যেমন এক হাত লম্বা একটি কাঠির আসল ছায়া দুপুরবেলা চার আঙ্গুল ছিল। তারপর ঐ কাঠির ছায়া যখন দুই হাত চার আঙ্গুল হবে তখন যোহরের সময় শেষ হয়ে যাবে। (তিরমিযি)

আসর : যোহরের সময় শেষ হলেই আসরের সময় শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তবে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করলে আসরের নামায আদায় করা মাকরুহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৮)

মাগরিব : সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে যতক্ষণ লালিমা থাকে ততক্ষণ সময় থাকে। মাগরিবের সময় খুবই কম। তাই সময় হওয়ার সাথে সাথেই নামায আদায় করে নেওয়া উত্তম।

এশা : মাগরিবের সময় শেষ হওয়ার পর এশার নামাযের সময় শুরু হয় এবং সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তবে রাতের প্রথম প্রহরের মধ্যে এশার নামায আদায় করা উত্তম। রাত দ্বিপ্রহরের পর আদায় করা মাকরুহ। (তিরমিযি)

বিতর : বিতর-এর আসল সময় শেষরাত। তবে এশার নামাযের সাথেও আদায় করা যায়। কিন্তু এশার আগে পড়া যায় না। (তিরমিযি)

কাজ : শিক্ষার্থীরা 'সালাত আদায় অত্যাবশ্যক কেন' এ বিষয়ে পাঁচটি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৯
সালাত আদায়ের নিয়ম

প্রতিটি কাজেরই একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। নিয়মমতো কাজ করলে সুফল পাওয়া যায়। নামায একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। নামায মহানবি (স.) প্রদর্শিত পন্থায় আদায় করা অত্যন্ত জরুরি। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, 'তোমরা নামায আদায় কর যেমনিভাবে আমাকে আদায় করতে দেখেছ।' (বুখারি)

কোনো প্রকার ভুল হলে নামাযের ক্ষতি হয়। এতে বান্দার গুনাহ হয়। বিনীত ও একাগ্রচিত্তে সালাত আদায় করতে হয়। লোকদেখানো কিংবা উদাসীনভাবে আদায়কৃত সালাত আল্লাহ কবুল করেন না। আল্লাহ বলেন—

"সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোকদেখানোর জন্য ওটা (সালাত) আদায় করে।" (সূরা আল-মাউন, আয়াত : ৪-৬)

নামায আদায়কালে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, নামাযের শর্তগুলোর কোনোটাই যেন বাদ না পড়ে। পবিত্র হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। মনে করতে হবে যে, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাকে দেখছেন।

দুই, তিন ও চার রাকআত বিশিষ্ট নামায আদায়ের নিয়মে কিছুটা তারতম্য আছে। নিচে এর বিবরণ দেওয়া হলো:

দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

কিবলামুখী হয়ে নিয়ত করে দুই হাত কানের লতি পর্যন্ত তুলে 'আল্লাহু আকবার' বলে নাভির নিচে হাত বাঁধব। তবে নারীগণ হাত তুলবে কাঁধ পর্যন্ত এবং বাম হাতের পিঠের ওপর ডান হাত রেখে বুকের উপর হাত বাঁধবে। নিয়ত মনে মনে করলেই চলবে। তবে মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। এরপর 'সানা' পড়ব। এরপর 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলে সূরা ফাতিহা পড়ব। ফাতিহা পড়ে মনে মনে 'আমিন' বলব। এরপর অন্য কোনো সূরার কমপক্ষে বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত কিংবা একটি সূরা পড়ব। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকু করব। রুকুতে কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম' বলব। তারপর 'সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ্' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। দাঁড়ানো অবস্থায় 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলব। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদাহ্ করব। সিজদায় অন্তত তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলব। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সোজা হয়ে বসব। আবার 'আল্লাহু আকবার' বলে দ্বিতীয় সিজদাহ্ করব। এবারও সিজদায় কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলব। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এভাবে প্রথম রাকআত শেষ হবে। এখন দ্বিতীয় রাকআত শুরু হলো। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলে সূরা ফাতিহা পড়ব। তারপর পূর্বের মতো সূরা মিলাব। তারপর প্রথম রাকআতের মতো রুকু ও সিজদাহ্ করে সোজা হয়ে বসব। তাশাহহুদ, দরূদ ও দোয়া মাসূরা পড়ে ডানে ও বামে মুখ ফিরিয়ে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলব। এইভাবে দুই রাকআত বিশিষ্ট নামায শেষ হবে।

তিন রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

তিন রাকআত বিশিষ্ট ফরজ নামাযে দ্বিতীয় রাকআতের পর বসা অবস্থায় শুধু তাশাহহুদ পড়ব। তারপর তাকবির বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এরপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ব। অন্য কোনো সূরা পড়ব না। এরপর পূর্বের মতো রুকু, সিজদাহ্ করব। সিজদাহ্ পর সোজা হয়ে বসে তাশাহহুদ, দরূদ ও দোয়া মাসূরা পড়ে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করব।

চার রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

চার রাকআত বিশিষ্ট ফরজ নামাযে দ্বিতীয় রাকআতের পর বসা অবস্থায় শুধু তাশাহহুদ পড়ব। পরে তৃতীয় রাকআতের জন্য তাকবির বলে উঠে দাঁড়াব। এরপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ব। তারপর রুকু-সিজদাহ্ করে, চতুর্থ রাকআতের জন্য উঠে দাঁড়াব। চতুর্থ রাকআতে তৃতীয় রাকআতের মতো সূরা ফাতিহা পড়ে রুকু, সিজদাহ্ করার পর বসে তাশাহহুদ, দরূদ ও দোয়া মাসূরা পড়ে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করব। ওয়াজিব, সুন্নত বা নফল নামায হলে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়ব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই উপকরণের মাধ্যমে নামায আদায়ের নিয়ম শ্রেণিতে অনুশীলন করবে। শিক্ষক মহোদয় সহযোগিতা করবেন।

২০২৫

পাঠ ১০
সালাতের ফরজ (فَرَائِضُ الصَّلٰوةِ)

সালাত (নামায) সহিহ্ বা শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতগুলো প্রয়োজনীয় বিষয় রয়েছে। যার কোনো একটি ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক, বাদ পড়লে নামায বাতিল হয়ে যাবে। নামাযে মোট ফরজ তেরোটি। নামাযের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক সাতটি ফরজ রয়েছে। এগুলোকে নামাযের আহকাম বলা হয়।

১. শরীর পবিত্র হওয়া।

২. পরিধানের কাপড় পবিত্র হওয়া।

৩. নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া। কমপক্ষে দাঁড়ানোর জায়গা থেকে সিজদাহ্‌র জায়গা পর্যন্ত পবিত্র হতে হবে।

৪. সতর ঢাকা। পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং নারীদের মুখমণ্ডল, দুই হাতের কব্জি, পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা।

৫. কিবলামুখী হওয়া। কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করতে হবে। কিবলা অজানা অবস্থায় অথবা জানার কোনো উপায় না থাকলে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী কিবলা নির্ধারণ করে নামায আদায় করবে।

৬. নামাযের সময় হওয়া।

৭. নিয়ত করা। যে ওয়াক্তের নামায আদায় করবে মনে মনে সেই ওয়াক্তের নামাযের নিয়ত করা। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাষায় নিয়ত করতে পারবে।

নামাযের ভিতরে ছয়টি ফরজ রয়েছে। এগুলোকে নামাযের আরকান বলা হয়।

১. তাকবিরে তাহরিমা বা আল্লাহু আকবার বলে নামায আরম্ভ করা।

২. দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা। দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে এবং বসতে সক্ষম না হলে শয়নাবস্থায় ইশারায় নামায আদায় করতে হবে।

৩. সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করা।

৪. রুকু করা।

৫. সিজদাহ্ করা।

৬. শেষ বৈঠক। যে বৈঠকের মধ্যে তাশাহ্হুদ, দরুদ ও দোয়া মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা হয় তাকেই শেষ বৈঠক বলে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা নামাযের আহকাম ও আরকানের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম পোস্টার পেপারে লিখবে। এরপর শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সালাতের ওয়াজিব

নামাযের ওয়াজিব বলতে এমন সব জরুরি বিষয় বোঝায় যার কোনো একটি ভুলবশত ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু দ্বারা নামায শুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে নামায ভঙ্গ (ফাসিদ) হয়ে যায় এবং পুনরায় নামায আদায় করতে হয়।

নামাযের ওয়াজিব চৌদ্দটি। এগুলো নিম্নরূপ:

১. প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া।

২. সূরা ফাতিহার সাথে কোনো একটি সূরা বা সূরার অংশবিশেষ পাঠ করা। অর্থাৎ আয়াত ছোট হলে কমপক্ষে তিনটি আয়াত এবং বড় হলে কমপক্ষে একটি আয়াত পাঠ করা।

৩. রুকু, সিজদাহ ও তিলাওয়াতের আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।

৪. নামাযের রুকনগুলো সঠিকভাবে আদায় করা।

৫. রুকু করার পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৬. দুই সিজদাহর মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

৭. প্রথম বৈঠক অর্থাৎ তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে দুই রাকআত পড়ার পর তাশাহ্হুদ পড়ার জন্য বসা।

৮. তাশাহ্হুদ পাঠ করা।

৯. ইমামের জন্য উচ্চস্বরে তিলাওয়াতের স্থলে উচ্চস্বরে এবং চুপে চুপে তিলাওয়াতের স্থলে চুপে চুপে তিলাওয়াত করা।

১০. বিতর নামাযে দোয়া কুনুত পাঠ করা।

১১. নামাযের মধ্যে সিজদাহ্র আয়াত পড়লে তিলাওয়াতে সিজদাহ্ করা।

১২. সিজদাহ্র মধ্যে উভয় হাত ও হাঁটু মাটিতে রাখা।

১৩. দুই ঈদে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা।

১৪. আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ বলে নামায শেষ করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেক দল নামাযের ওয়াজিবগুলোর নাম পোস্টার পেপারে লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

২০২৫

সালাতের সুন্নত

রাসুলুল্লাহ (স.) নামাযের মধ্যে ফরজ ওয়াজিব ছাড়াও কিছু আমল বা কাজ করেছেন কিন্তু এগুলো আদায়ের ব্যাপারে ফরজ ওয়াজিবের ন্যায় তাগিদ করেননি। এগুলোকে বলা হয় সুন্নত। যদিও এগুলো ছুটে গেলে নামায নষ্ট হয় না কিংবা সাহু সিজদাহ্ দিতে হয় না, তথাপি এগুলো মেনে চলা উচিত। কারণ রাসুলুল্লাহ (স.) এভাবে নামায আদায় করেছেন এবং অন্যকেও আদায় করতে বলেছেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'তোমরা নামায আদায় কর, যেমনিভাবে আমাকে নামায আদায় করতে দেখেছ।' (বুখারি)

সালাতের সুন্নত একুশটি। এগুলো নিম্নরূপঃ

১. তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় পুরুষের কানের লতি ও নারীদের কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত উঠানো। ২. তাকবির বলার সময় দুই হাতের আঙ্গুলগুলো খুলে রাখা এবং কিবলামুখী করে রাখা। ৩. নিয়ত করার পর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা। পুরুষের জন্য নাভির নিচে এবং নারীর জন্য বুকের উপর হাত রাখা। ৪. তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় মাথা অবনত না করা। ৫. ইমামের জন্য জোরে তাকবির বলা। ৬. সানা পড়া। ৭. আউযুবিল্লাহ পড়া। ৮. প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পূর্বে মনে মনে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া। ৯. ফরজ নামাযের তৃতীয়, চতুর্থ রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া। ১০. ফাতিহার পর আমিন বলা। ১১. সানা, আউযুবিল্লাহ, আমিন আস্তে বলা। ১২. এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার সময় তাকবির বলা। ১৩. রুকু এবং সিজদায় তাসবিহ পড়া। ১৪. রুকুতে মাথা ও কোমর সোজা রাখা এবং দুই হাতের আঙ্গুল দিয়ে উভয় হাঁটু ধরা। ১৫. রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ইমামের 'সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ্' ও মুক্তাদির 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলা। ১৬. সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু, তারপর দুই হাত, তারপর নাক এবং সর্বশেষ কপাল মাটিতে রাখা। ১৭. বসার সময় বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া রাখা। ১৮. তাশাহহুদে লা-ইলাহা এর 'লা' উচ্চারণের সময় শাহাদাত আঙ্গুল উঠানো। ১৯. শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরুদ পড়া। ২০. দরুদের পর দোয়া মাসূরা বা এই জাতীয় কোনো দোয়া পড়া। ২১. প্রথমে ডানে এবং পরে বামে সালাম ফেরানো।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে এবং প্রত্যেক দল নামাযের সুন্নতগুলো পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সালাতের মুস্তাহাব

নামাযে এমন কিছু কাজ আছে যা মেনে চললে সাওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু ছেড়ে দিলে গুনাহ্ হয় না। এগুলোকে বলা হয় মুস্তাহাব। নামাযের কতিপয় মুস্তাহাব নিচে দেওয়া হলো :

১. নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদাহ্‌র স্থানে দৃষ্টি রাখা। ২. রুকুর সময় পায়ের উপর, সিজদাহ্‌র সময় নাকের উপর এবং বসা অবস্থায় কোলের উপর দৃষ্টি রাখা। ৩. হাঁচি এলে, হাই উঠলে, কাশি এলে যথাসম্ভব চেপে রাখার চেষ্টা করা। ৪. ধীরস্থিরভাবে কুরআন পাঠ করা। ৫. সিজদাহ্‌র সময় উভয় হাতের মধ্যস্থানে মাথা রাখা। ৬. মাগরিবের নামাযে ছোট সূরা পাঠ করা। ৭. একা একা নামায আদায়কালে রুকু, সিজদায় তাসবিহ তিনবারের বেশি (পাঁচ, সাত, নয় ইত্যাদি) পড়া।

সালাত ভঙ্গ হওয়ার কারণ

নামাযের শুরুতে আমরা নিয়ত করে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বাঁধি, একে বলা হয় তাকবিরে তাহরিমা। এই তাকবির বলার পর অন্য কোনো কাজ বা কথা বলা হারাম হয়ে যায়। যদি কেউ এমন করে ফেলে তবে নামায বাতিল হবে। কী কী কাজ করলে নামায ভেঙে যায় তা আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। নামায ভঙ্গ হওয়ার কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. নামাযের মধ্যে কাউকে সালাম দিলে এবং সালামের উত্তর দিলে। ২. নামাযের মধ্যে কথা বললে। ৩. কিছু খেলে। ৪. কিছু পান করলে। ৫. শব্দ করে হাসলে। ৬. বিপদ বা কষ্টের কারণে উচ্চস্বরে কাঁদলে। ৭. ব্যথা বা রোগের কারণে উহ্ আহ্ এরূপ শব্দ করলে। ৮. কুরআন মজিদ দেখে পড়লে। ৯. কিবলার দিক থেকে সীনা ঘুরালে। ১০. দুই হাত দিয়ে কোনো কাজ করলে। ১১. মুক্তাদি ইমাম অপেক্ষা সামনে দাঁড়ালে। ১২. অপবিত্র স্থানে সিজদাহ্ করলে। ১৩. দুনিয়ার কোনো কিছু প্রার্থনা করলে। ১৪. বিনা কারণে বারবার কাশি দিলে। ১৫. নামাযের কোনো ফরজ বাদ গেলে। ১৬. কোনো সুসংবাদে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বললে। ১৭. কোনো দুঃসংবাদে 'ইন্নালিল্লাহ্' বললে। ১৮. হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বললে। ১৯. হাঁচির উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বললে। ২০. নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কারো ভুল ধরলে। ২১. আমলে কাসির করলে (এমন কাজ করা যা দেখলে মানুষ মনে করবে, সে নামায পড়ছে না)।

সালাত মাকরুহ্ হওয়ার কারণ

এমন কিছু কাজ আছে যা করলে নামায নষ্ট না হলেও সাওয়াব কম হয়, সেগুলো সালাতের মাকরুহ কাজ। নিম্নে এমন কতগুলো কাজের কথা উল্লেখ করা হলো :

১. নামাযে বিনা কারণে আঙুল মটকানো। ২. আলসেমি করে খালি মাথায় নামায আদায় করা। ৩. কাপড় ধুলাবালি থেকে বাঁচানোর জন্য গুটিয়ে নেওয়া। ৪. পরনের কাপড়, বোতাম, দাড়ি ইত্যাদি অহেতুক নাড়াচাড়া করা। ৫. ময়লা ও অশালীন পোশাক পরে নামায আদায় করা। ৬. প্রস্রাব-পায়খানা চেপে রেখে নামায আদায় করা। ৭. নামাযে এদিক-ওদিক তাকানো। ৮. সিজদায় দুই হাত কনুই পর্যন্ত বিছিয়ে দেওয়া। ৯. ইমামের মেহরাবের ভিতরে দাঁড়ানো। ১০. প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় পরা। ১১. আগের কাতারে জায়গা থাকলেও একাকী পিছনে দাঁড়ানো। ১২. ইশারায় সালাম করা। ১৩. শুধু কপাল অথবা শুধু নাক মাটিতে ঠেকিয়ে সিজদাহ্ করা। ১৪. বিনা কারণে শুধু ইমামের উঁচুস্থানে দাঁড়ানো। ১৫. বিনা কারণে চারজানু হয়ে বসা। ১৬. চোখ বন্ধ করে নামায আদায় করা। ১৭. তিলাওয়াত পূর্ণ না করেই রুকুর জন্য ঝুঁকে পড়া। ১৮. সিজদাহ্র সময় পা মাটি থেকে উপরে উঠানো। ১৯. নামাযে আয়াত, তাসবিহ আঙুল দিয়ে গণনা করা। ২০. তিলাওয়াতে অসুবিধা হয় মুখে এমন কোনো জিনিস রাখা।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

তিন সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ : ১. ঠিক সূর্যোদয়ের সময়। ২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়। ৩. সূর্যাস্তের সময়, তবে কোনো কারণে ঐ দিনের আসরের নামায আদায় করা না হলে তা ঐ সময় আদায় করা যাবে কিন্তু মাকরুহ হবে।

সালাতের মাকরুহ্ সময়

১. ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত। ২. আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ৩. ফজরের সময় হলে ঐ সময়ের সুন্নত ছাড়া অন্য কোনো নামায পড়া। ৪. ফরজ নামাযের জন্য যখন তাকবির দেওয়া হয় তখন অন্য নামায শুরু করা। ৫. যখন ইমাম জুমুআর খুতবা দিতে থাকেন তখন কোনো নামায শুরু করা। ৬. এশার নামায মধ্যরাতের পরে পড়া।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে নামায ভঙ্গ হওয়ার কারণগুলো লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১১
সিজদাহ্ (اَلسَّجْدَةُ)

'সিজদাহ্' আরবি শব্দ। এর অর্থ মাথা অবনতকরণ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য বান্দা তার কপাল জমিনে রাখাকে সিজদাহ্ বলে।

সিজদাহ্র প্রকারভেদ

ফরজ সিজদাহ্ : মানুষ নামায আদায়ের সময় যেসব সিজদাহ্ দিয়ে থাকে তাকে ফরজ সিজদাহ্ বলে।

ওয়াজিব সিজদাহ্ : ভুলবশত নামাযে কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে এবং সিজদাহ্র আয়াত তিলাওয়াত করলে যে সিজদাহ্ দিতে হয় তাকে ওয়াজিব সিজদাহ্ বলে।

মুস্তাহাব সিজদাহ্ : কোনো নিয়ামতপ্রাপ্ত হলে, বিপদমুক্ত হলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে যে সিজদাহ্ দেওয়া হয় তাকে মুস্তাহাব সিজদাহ্ বলে।

সিজদায়ে সাহু : সিজদায়ে সাহু অর্থ ভুলের জন্য সিজদাহ্। ভুলবশত নামাযে ওয়াজিব বাদ পড়লে, তা সংশোধনের জন্য নামাযের শেষ বৈঠকে দুটি সিজদাহ্ করা হয়, একেই সিজদায়ে সাহু বলে।

সিজদায়ে সাহু আদায় করার নিয়ম

নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফেরাব। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাযের সিজদাহ্র ন্যায় দুটি সিজদাহ্ করে তাশাহ্হুদ, দরুদ ও দোয়া মাসূরা পড়ব। তারপর দুইদিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করব। সিজদায়ে সাহু সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, 'আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমনি ভুলে যাই। সুতরাং যখন আমি ভুলে যাব তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে সন্দেহ করবে তখন সে গভীর চিন্তা করে সঠিক বিষয়টি ঠিক করে নেবে। অতঃপর এর উপর ভিত্তি করে নামায পূর্ণ করবে এবং সালাম দিয়ে দুটি সিজদাহ্ করবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার কারণ

১. ভুলবশত নামাযের কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে। ২. নামাযের কাজগুলো পরপর আদায় করতে বিলম্ব করলে (যেমন: সূরা ফাতিহা পড়ার পর চুপ করে থাকলে, কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর কোনো সূরা পড়লে)। ৩. কোনো ফরজ আদায় করতে বিলম্ব হলে। ৪. নামায আদায়ে ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম হলে (যেমন: রুকুর আগেই সিজদাহ্ করলে)। ৫. কোনো ফরজ একবারের স্থলে একাধিকবার করলে। ৬. কোনো ওয়াজিবের রূপ পরিবর্তন করলে (যেমন: সরবে তিলাওয়াতের স্থলে নীরবে এবং নীরবে তিলাওয়াতের স্থলে সরবে পড়লে)।

মনে রাখা দরকার, প্রথম বৈঠক করতে ভুলে গেলে যদি দাঁড়ানোর পূর্বেই মনে পড়ে তাহলে বসে যাব এবং বৈঠক পূর্ণ করব। আর যদি দাঁড়ানোর পর মনে পড়ে তাহলে বসব না। নামায শেষে সাহু সিজদাহ্ করব।

কাজ : সিজদাহ্ সাহু ওয়াজিব হওয়ার কারণগুলো ছক আকারে লিখে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১২

সিজদায়ে তিলাওয়াত (سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ)

পবিত্র কুরআন মজিদে কতগুলো আয়াত আছে যা পড়লে বা শুনলে সিজদাহ্ করা জরুরি। সিজদাহ্ আদায় না করলে গুনাহগার হবে। হাদিসে আছে, 'যখন কেউ সিজদাহ্র আয়াত পড়ে সিজদাহ্ করে তখন শয়তান একপাশে বসে বিলাপ করতে থাকে এবং বলে, হায় আফসোস! আদম সন্তানদের সিজদাহ্র হুকুম দেওয়া হলো, তারা সিজদাহ্ করল এবং জান্নাতের দাবিদার হলো। আর আমাকে সিজদাহ্র হুকুম দেওয়া হলো আমি অস্বীকার করে জাহান্নামি হলাম।' (মুসলিম)

সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ম

কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ত করে 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদাহ্ করতে হয়। সিজদাহ্ করার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠে দাঁড়াতে হয়। তাশাহহুদ পড়া ও সালাম ফেরানোর প্রয়োজন নেই। সিজদায়ে তিলাওয়াতে একটি সিজদাহ্ করলেই চলবে।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের চারটি শর্ত

১. তাহারাত অর্থাৎ পবিত্র হওয়া। ২. সতর ঢাকা। ৩. কিবলামুখী হওয়া। ৪. সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ত করা।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের স্থান

১. সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ২০৬। ২. সূরা রা'দ, আয়াত : ১৫। ৩. সূরা আন-নাহ্ল, আয়াত : ৫০। ৪. সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১০৯। ৫. সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৮। ৬. সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত : ১৮, ৭৭। ৭. সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ৬০। ৮. সূরা আন-নামল, আয়াত : ২৬। ৯. সূরা সাজদাহ, আয়াত : ১৫। ১০. সূরা সোয়াদ, আয়াত : ২৪। ১১. সূরা হা-মীম-আস্-সাজদাহ, আয়াত : ৩৮। ১২. সূরা আন-নাজ্ম, আয়াত : ৬২। ১৩. সূরা আল-ইন্শিকাক, আয়াত : ২১। ১৪. সূরা আল-আলাক, আয়াত : ১৯।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং সূরার নাম ও আয়াত নম্বরসহ সিজদায়ে তিলাওয়াতের স্থানসমূহ ছক আকারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৩
সালাতের নৈতিক শিক্ষা

সালাত (নামায) ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এর সাথে নৈতিকতা বিষয়টি বিশেষভাবে জড়িত। ইসলামি বিধান অনুযায়ী নামায আদায় করলে একে তো আল্লাহর আইন পালন করা হয়, অপরদিকে বান্দার পার্থিব জীবনেও নৈতিকতার উন্নতি ঘটে। আর কোনো মানুষের নৈতিকতার উন্নতি ঘটলে, দুনিয়াতে যেমনি পাবে সম্মান ও মর্যাদা তেমনি পরকালেও পাবে সুখ-শান্তি।

নিচে নামাযের কতিপয় নৈতিক বিষয় বর্ণনা করা হলো :

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

নামায আদায়কারীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকতে হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে একজন মুমিন যখন নামায আদায় করবে তখন তাকে অবশ্যই ওযু করতে হয়। আর নামাযের পূর্বশর্তসমূহের একটি হলো পবিত্রতা অর্জন করা। যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

অর্থ : "যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে পবিত্রতা অর্জন কর।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৬)

নামাযের আগে রাসুলুল্লাহ (স.) মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যথানিয়মে দাঁত পরিষ্কার করলে মুখে দুর্গন্ধ থাকে না। রোগের আশঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকা যায়। তিনি বলেন, 'আমার উম্মতের উপর কষ্টকর না হলে আমি তাদের প্রতি নামাযে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।' (ইবনু মাজাহ)

নামায আদায় করতে হলে দৈনিক পাঁচবার ওযু করতে হয় যা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় অঙ্গকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করে। এটা নাক, মুখ, চোখ, দাঁত ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখার অতুলনীয় কৌশলও বটে। যদি মুসল্লির শরীর, জামাকাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে অন্য মুসল্লির কষ্ট হয় না। বরং সুন্দর ও সুস্থ মন নিয়ে একে অপরের সাথে দাঁড়াতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার এ শিক্ষা নামায থেকেই পাওয়া যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক দল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জনে সালাতের ভূমিকা বিষয়ক একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সময়ানুবর্তিতা

নামায নিয়মানুবর্তিতা ও সময়নিষ্ঠা শিক্ষা দেয়। একজন মুমিন ব্যক্তিকে দৈনিক পাঁচবার নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করতে হয়। এতে সে সময়ের প্রতি সচেতন হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে জামাআতে নামায অনুষ্ঠিত হয়। কোনো ব্যক্তি সময়মতো জামাআতে নামায আদায় করতে না পারলে সে জামাআতের সাওয়াব হতে বঞ্চিত হবে। কিছু সময় পরই নামায আদায় করতে হয় বলে সময়কে শিথিল করা যায় না। বরং সবসময়ই নামাযের আহবানে সাড়া দেওয়ার জন্য মুমিন ব্যক্তিকে প্রস্তুত থাকতে হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১০৩)

প্রতিদিন পাঁচবার নির্ধারিত সময়ে জামাআতে নামায আদায় করা মুমিন বান্দাকে সময়নিষ্ঠ হতে এবং সময়ের প্রতি গুরুত্ব উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করে। অকারণে তিনি সময় নষ্ট করেন না। সমাজের অপরাপর লোকের সাথে সময়মতো কর্তব্য কাজে অভ্যস্ত হন।

এতে সে জীবনের সব কাজেই সময়নিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। আজকের শিশু আগামী দিনে জাতির কর্ণধার। প্রত্যেক মুসলিম দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের মাধ্যমে সময়নিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ হলে সে অবশ্যই একটি জাতির অমূল্য মানবসম্পদে পরিণত হবে। সময়মতো নামায আদায় করার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার কর্মস্থলে যথাসময়ে কর্তব্য পালনের শিক্ষা গ্রহণ করবে। সে কোনো কাজ আগামী দিনের জন্য ফেলে রাখবে না। বরং যথাসময়ে কঠোর পরিশ্রমে ঐ কাজ সম্পন্ন করবে। দেশের সেনাবিভাগ কঠোর সময়ানুবর্তিতার দিকে মনোনিবেশ করে। এ বিভাগে কর্তব্যরত সৈনিকগণকে নির্ধারিত সময়ে বিউগল বেজে উঠলে শয্যা ত্যাগ করে ইউনিফর্ম পরিধান করে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ বা কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। দেশ রক্ষা ও শত্রুদের সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলার জন্যই সৈন্যদেরকে এরূপ শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। অথচ তাদের জীবনে এরূপ দুঃসময় নাও আসতে পারে। কিন্তু মুসলিমগণ অবিরত তাদের কর্তব্য পালনে নিয়োজিত। তাদের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অসৎ ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তাদের সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে। মহান আল্লাহ দৈনিক পাঁচবার তাঁর মুমিন বান্দাকে আযানের মাধ্যমে নামাযের আহবান জানান। এ আহবানে আল্লাহর সৈনিকগণ দৌড়ে আসবে এবং প্রমাণ করবে, সবসময় ও সকল অবস্থায় তারা আল্লাহর হুকুম পালনে প্রস্তুত।

কাজ : 'সময়ানুবর্তিতাই মানুষের ইহজীবনে সম্মান বাড়ায়' – এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্কের আয়োজন করবে।

শৃঙ্খলা

শৃঙ্খলা মানে সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব অপরিসীম। রাস্তাঘাটে যানবাহন চালনায় চালককে যেমন একটি বিশেষ নিয়ম মানতে হয়। আর এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। তেমনি মানুষের জীবনও একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতির অধীনে আবদ্ধ। বিশৃঙ্খলভাবে জীবন পরিচালনা করলে বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। আর যদি সুশৃঙ্খলভাবে জীবন পরিচালনা করে তাহলে নিজে যেমন উপকৃত হবে তেমনি সমাজের অন্য ব্যক্তিও নিরাপদে থাকবে। শৃঙ্খলার এই শিক্ষা নামায থেকেই পাওয়া যায়।

নামাযে একাকী হোক আর জামাআতবদ্ধ হোক বান্দাকে এক কিবলার দিকেই মুখ ফেরাতে হয়। একই সময়ে নির্দিষ্ট নামায আদায়ের জন্য একই ইমামের পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হয়। এভাবে নামায আদায়ের ফলে মুমিনের মাঝে শৃঙ্খলাবোধ, নেতার প্রতি আনুগত্যবোধ গড়ে ওঠে। সমাজে কোনো সমস্যা দেখা দিলে, সকলে মিলেমিশে মীমাংসা করার শিক্ষা নামাযের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

> **কাজ :** নামায আদায়ের মাধ্যমে একজন মানুষ তার কর্মস্থলেও সুশৃঙ্খল হয়, এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

একাগ্রতা

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করা। নামাযের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নিকট তার আবেদন নিবেদন পেশ করে তৃপ্তি লাভ করতে পারে। আর আল্লাহ তায়ালাও বান্দার আবেদন গ্রহণ করে থাকেন। তাহলে বান্দাকে অবশ্যই বিনয়ের সাথে নামাযে দাঁড়াতে হবে। যেমন : কুরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

"তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৮)

নামায অবস্থায় বান্দার মন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে অথচ নামাযি টেরও পায় না। কারণ, মানব মন কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। গভীর মনোযোগের সাথে কোনো কাজে নিয়োজিত না হলে মন স্থির থাকে না। তাছাড়া শয়তান হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে বান্দার সকল ইবাদত বিশেষত নামায নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন বিষয় মনের মধ্যে হাজির করে দেয়। তাই বান্দার মন নামাযে ঠিক থাকে না। এজন্যই বান্দাকে খুশু খুযু (বিনয় ও একাগ্রতা) ও মনের স্থিরতার সাথে নামায আদায় করতে হবে। যেমন পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "মুমিনগণ অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী।" (সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত : ১, ২)

> **কাজ :** 'একাগ্রতা হচ্ছে নামায কবুল হওয়ার একমাত্র উপায়।' শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করবে।

নিয়মানুবর্তিতা

নামায মানুষকে নিয়মানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যে প্রশিক্ষণের মধ্যে মানবজাতির কল্যাণ নিহিত। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষ যা অর্জন করে তা নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. মানুষ তার প্রভুর কর্তব্য পালনে অভ্যস্ত হয়।

২. সমাজে কে অনুগত আর কে বিদ্রোহী নামায তা নির্ধারণ করে দেয়।

৩. মানুষকে ইসলামের পরিপূর্ণ আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে তোলে এবং তাকে ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকতে সাহায্য করে।

৪. এটি বান্দার চারিত্রিক শক্তিকে আরও দৃঢ় করে।

নামায মানব চরিত্রের দুর্বলতা দূর করে। সাত বছর বয়সে ছেলেমেয়েদের নামাযের তাগিদ দিতে বলা হয়েছে। এতে তারা শিথিলতা করলে দশ বছর বয়সে তাদের প্রহার করে নামাযে অভ্যস্ত করে তোলার নির্দেশ রয়েছে। নামায আদায়ের দায়িত্ব হতে কেউ রেহাই পায় না। নামাযের সময় হলে সকল মুমিন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় নামায আদায় করতে বাধ্য।

যে ব্যক্তি নিয়মনীতি মেনে, সময়নিষ্ঠ হয়ে একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করবে, সে অবশ্যই হবে একজন দায়িত্ব সচেতন, সুশৃঙ্খল ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। এমন ব্যক্তি সমাজে শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সাম্য

জামাআতে নামায আদায়কারী মুসল্লিগণ মসজিদে একত্র হয়ে একই কাতারে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়। সকল মুক্তাদিই ইমামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে। তখন ধনী-গরিব, আমির-ফকির, শাসক-শাসিত, ছোটো-বড়ো ভেদাভেদ থাকে না। মসজিদে ইমাম মুয়াযযিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য স্থান নির্ধারিত থাকে না। এটি ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদের মূর্ত প্রতীক। সমাজে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। সামাজিক যেকোনো সমস্যা সমাধানে একতাবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসে এবং শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য সমাধান দিতে সক্ষম হয়।

সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের এ শিক্ষা একজন মুমিনকে সমাজের অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, দায়িত্বশীল ও সহযোগিতার মনোভাব সম্পন্ন করে গড়ে তোলে। এতে সমাজে ছোটো-বড়ো, ধনী-গরিব শ্রেণিবৈষম্য ইত্যাদি দূর হয় এবং অতুলনীয় সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এর ফলেই সমাজে কোনো রকম কলহ-বিবাদ থাকতে পারে না। বরং প্রতিষ্ঠিত হয় একটি আদর্শ সমাজ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে নামায থেকে নিয়মানুবর্তিতা ও সাম্যের যেসব শিক্ষা পাওয়া যায়–তার তালিকা প্রণয়ন করবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১। পবিত্র থাকলে .... সুস্থ থাকে।

২। পবিত্রতা ও অপবিত্রতার মানদণ্ড হচ্ছে .... ।

৩। ভালোভাবে ওযু করলে মন .... থাকে।

৪। আল্লাহর নিকট বান্দার আনুগত্য প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে .... ।

৫। নিশ্চয়ই .... হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১। তায়াম্মুমের	ফরজ চারটি।
২। সালাতের আরকান	ফরজ তিনটি।
৩। ওযুর	ফরজ।
৪। সালাতে সূরা	সাতটি।
৫। সতর ঢাকা	ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। ইবাদত কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। তায়াম্মুম বলতে কী বোঝ?

৩। সালাতে একাগ্রতা বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। পবিত্র থাকার উপায় ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

২। দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম বর্ণনা কর।

৩। বাস্তব জীবনে সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। তায়াম্মুম শব্দের অর্থ কী?

ক. বিরত থাকা	খ. গোসল করা
গ. ইচ্ছা করা	ঘ. দোয়া করা

২। নামাযে মোট কতটি ফরজ?

ক. ১৩টি	খ. ১৪টি
গ. ১৫টি	ঘ. ১৬টি

৩। সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার কারণ–

i. নামায আদায়ে ধারাবাহিকতা মেনে না চলা
ii. ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোনো ওয়াজিব বাদ পড়া
iii. কোনো ফরজ আদায় না করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

লুৎফুর আহমেদ বেশ ভ্রমণপ্রিয় মানুষ। একদিন বেড়াতে গিয়ে সীতাকুণ্ডে একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। তখন আসরের নামাযের সময় হয়ে গেছে। তখনই তিনি এক দলা মাটি নিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে সমস্ত মুখমণ্ডল ও কনুইসহ দুই হাত মাসেহ্ করে আসরের নামায আদায় করলেন। নামায আদায়ের ব্যাপারে তিনি যেমন সবসময় তৎপর, তেমনি আল্লাহ্, রাসুল, পরকাল ইত্যাদি বিষয়েও তিনি পুরোপুরি বিশ্বাসী। পাশাপাশি তিনি তার চালচলন এবং ব্যবহারেও সংযমী। তিনি কখনো কারো অনুপস্থিতিতে কারো বদনাম করেন না।

৪। জনাব আহমেদ কী করে নামায আদায় করলেন?

ক. ওযু	খ. তায়াম্মুম
গ. তাহারাতুন	ঘ. সিজদাহ্ সাহু

৫। উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আহমেদের বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডকে কী নামে আখ্যায়িত করা যায়?

ক. অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা	খ. বাহ্যিক পবিত্রতা
গ. নাজাসাতে হাকিকি	ঘ. নাজাসাতে হুকমি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শরীফ ও আরিফ সহপাঠী। শরীফ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ সকল প্রকার ইবাদত করার চেষ্টা করে। সে অনেকবার আরিফকে নামাযে আহবান করেছে কিন্তু আরিফ বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে নামায পড়া থেকে বিরত থেকেছে। শরীফ যখন আরিফকে ইবাদতের কথা বলে তখন আরিফ বলে, 'শুধু যে আমি একা ইবাদত করি না তাতো নয়। অনেকেই তো আছে যারা কোনো প্রকার ইবাদত করে না। তাদের যা হবে আমারও তাই হবে।'

ক. ইবাদত শব্দের অর্থ কী?
খ. আমাদের পবিত্র থাকা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের আলোকে শরীফের চরিত্র ব্যাখ্যা কর।
ঘ. আরিফের পরিণতি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। হারুন অর রশিদ এবং আমজাদ হোসেন একই অফিসে চাকরি করেন। হারুন অর রশিদ প্রতিদিন ফজরের আযান হলেই ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করেন। তারপর সকালের যাবতীয় কাজ শেষ করে যথাসময়ে অফিসে আসেন। অন্যদিকে আমজাদ হোসেন ফজরের সময় ঘুমিয়ে থাকেন। নামায আদায় করেন না। তাঁর অফিসে আসতে প্রতিদিন দেরি হয়। যার কারণে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁকে বকাঝকা করেন।

ক. গোসল শব্দের অর্থ কী?
খ. সালাত আদায়ের অন্যতম কারণটি ব্যাখ্যা কর।
গ. আমজাদ হোসেনের মধ্যে কোন জিনিসের অভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. হারুন অর রশিদের মধ্যে কী নৈতিকতার প্রতিফলন হয়েছে? বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

কুরআন মজিদ হলো মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী। আর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে বলা হয় হাদিস। কুরআন মজিদ ও হাদিস শরিফ হলো ইসলামের প্রধান দুটি উৎস। মহানবি (স.) বলেছেন, আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরলে (মেনে চললে) তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটি হলো আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) ও তাঁর রাসুলের সুন্নত (মুসলিম)।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- আল-কুরআনের পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- আল-কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তাজবিদ-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ও মাখরাজ আয়ত্ত করে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতে সক্ষম হবো।
- কুরআনের নির্ধারিত পাঁচটি সূরা অর্থসহ মুখস্থ বলতে ও মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নির্ধারিত পাঁচটি সূরার পটভূমি (শানে নুযুল) ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মুনাজাতমূলক (প্রার্থনামূলক) তিনটি আয়াত অর্থসহ বলতে পারব।
- হাদিসের পরিচয় ও গুরুত্ব এবং নৈতিক গুণাবলি বিষয়ক দুটি হাদিসের অর্থসহ শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।
- মুনাজাতমূলক দুটি হাদিস অর্থসহ পড়তে, বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হাদিসের আলোকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ ১

আল-কুরআনের পরিচয়

পরিচয়

কুরআন মজিদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এটি মহান আল্লাহর বাণী। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর এ কিতাব নাজিল করেন। আল্লাহ তায়ালার পরিচয়, তার গুণাবলি, ঈমান ও ইসলামের সকল বিষয় এতে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে রয়েছে জ্ঞানবিজ্ঞানের সারকথা। কোন পথে চললে মানুষ সফলতা লাভ করবে তাও এতে বলে দেওয়া হয়েছে।

এটি মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী। আজ পর্যন্ত এটি অবিকৃত রয়েছে। কেউ এর একটি নুকতা, অক্ষর, শব্দ বা হরকতও পরিবর্তন করতে পারেনি। আর ভবিষ্যতেও পারবে না। কেননা, এর সংরক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা।

কুরআন মজিদ অবতরণ

আল-কুরআন সর্বশেষ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এটি 'লাওহি মাহফুয' বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আরব দেশের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানকার লোকজন ছিল মূর্তিপূজক। তাদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি, কাটাকাটি ও কলহ-বিবাদ লেগেই থাকত। মহানবি (স.) এসব পছন্দ করতেন না। তিনি ভাবতেন যে, সকল মানুষের একজনই সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তাঁর দেখানো পথে চললে সমাজে কোনোরূপ অশান্তি থাকবে না। এজন্য তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হন। আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল (আ.) ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁর নিকট আল-কুরআন নাজিল করেন। এ সময় আল-কুরআনের সূরা আল-আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজিল হয়। পরবর্তীকালে প্রয়োজন অনুসারে কুরআনের নানা আয়াত নাজিল করা হয়। এভাবে মহানবি (স.)-এর উপর ২৩ বছরে পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে নাজিল হয়।

আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য

আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব। আল্লাহ তায়ালা সর্বমোট ১০৪ (একশত চার) খানা আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এগুলোর মধ্যে ১০০ (একশত) খানা ছোট কিতাব। এগুলোকে বলা হয় সহিফা। আর ৪ (চার) খানা বড়ো। এগুলো হলো– তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ও কুরআন। আল-কুরআন হলো সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ। এরপর আর কোনো কিতাব আসবে না।

কুরআন মজিদ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এতে দীনের যাবতীয় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের জীবনে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে তার সমাধানের ব্যাপারে এতে নির্দেশনা রয়েছে। পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের মূল শিক্ষাও এতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব।

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী। এর ভাব ও ভাষা অনন্য ও অপূর্ব। এটি মহানবি (স.)-এর সবচেয়ে বড়ো মু'জিযা। কেউই এর ক্ষুদ্রতম সূরার সমতুল্য কিছু রচনা করতেও সক্ষম হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

আল-কুরআনের গুরুত্ব

আল-কুরআন জ্ঞানসমূহের ভাণ্ডার। এতে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার পরিচয়, তাঁর গুণাবলির বর্ণনা, তাঁর ক্ষমতা ও নিয়ামতসমূহের বর্ণনা। আল-কুরআনে মানব সৃষ্টির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। সৌরজগৎ, আসমান জমিন, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়, পর্বত সবকিছু সম্পর্কেই এতে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনা, নবি-রাসুলগণের বিবরণ, পুণ্যবান ও পাপীদের অবস্থা ইত্যাদিও আল-কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল-কুরআনে নানারকম বিধিবিধান ও আইনকানুন বর্ণিত হয়েছে। এটি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। কীভাবে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি লাভ করবে এর দিকনির্দেশনাও আল-কুরআনে দেওয়া আছে। আল-কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এতে দীনের সকল কিছুর জ্ঞান সন্নিবেশিত আছে। আল-কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য। সুতরাং আমরা আল-কুরআন পড়ব এবং এর নানাবিধ জ্ঞান অর্জন করব।

পাঠ ২
কুরআন তিলাওয়াত (تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ)

পরিচয়

তিলাওয়াত আরবি শব্দ। এর অর্থ পাঠ করা, পড়া, আবৃত্তি করা। পবিত্র কুরআন পাঠ করাকে কুরআন তিলাওয়াত বলা হয়।

আল-কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে। সুতরাং একে আরবিতেই পড়তে হবে। এজন্য আরবি হরফ বা বর্ণসমূহ চিনে তিলাওয়াত করা শিখতে হবে। এভাবে আরবিতে সুন্দর করে স্পষ্ট উচ্চারণে আল-কুরআন পাঠ করাকে কুরআন তিলাওয়াত বলে।

উল্লেখ্য, কুরআন শব্দটির মূল অর্থ পঠিত। অর্থাৎ যা পাঠ করা হয়েছে। সারা বিশ্বে আল-কুরআনই সবচেয়ে বেশি পাঠ (তিলাওয়াত) করা হয়। এজন্যই একে কুরআন বলা হয়। মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচবার সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করেন। এছাড়া আমরা অন্য সময়েও কুরআন তিলাওয়াত করে থাকি।

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব

কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের গুরুত্ব অনেক। এটি আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এতে মানুষের কল্যাণের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের উচিত বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। কুরআন তিলাওয়াত করলে আমরা আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ জানতে পারব। বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম।

আমাদের প্রিয় নবি (স.) এবং তাঁর সাহাবিগণ প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করতেন। কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। কেননা সালাতে (নামাযে) কুরআন পড়তে হয়। আর কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না। সুতরাং আমরা গুরুত্ব সহকারে শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত শিখব এবং প্রতিদিন তিলাওয়াত করব।

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত (মাহাত্ম্য) অনেক বেশি। কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা হলো নফল ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত। কুরআন তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন। যে ঘরে কুরআন পড়া হয় সে ঘরে আল্লাহ পাকের রহমত নাজিল হয়। মহানবি (স.)-এর হাদিসে আছে, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফের পরিবর্তে দশটি করে নেকি লেখা হয়। সুতরাং বোঝা গেল যে, কুরআন তিলাওয়াত অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ কাজ। আমরা সবাই বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করব।

নাযিরা তিলাওয়াত

আল-কুরআন দেখে দেখে পড়াকে নাযিরা তিলাওয়াত বলে। কুরআন মজিদ দেখে পড়াও উত্তম ইবাদত। কুরআন মজিদ দেখে দেখে অথবা মুখস্থ যেভাবেই পাঠ করা হোক তাতে পুণ্য রয়েছে। কুরআন পাঠ মনে প্রশান্তি আনে। অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ হয়। কিয়ামতের দিন কুরআন আল্লাহর নিকট তাদের জন্য সুপারিশ করবে যারা পৃথিবীর জীবনে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করত।

পাঠ ৩
তাজবিদ (اَلتَّجْوِيْدُ)

তাজবিদের পরিচয়

তাজবিদ শব্দের অর্থ উত্তম বা সুন্দর করা। আল-কুরআনের আয়াতসমূহকে উত্তমরূপে বা সুন্দর ও শুদ্ধ করে পড়াকে তাজবিদ বলা হয়। অর্থাৎ আল-কুরআনের প্রতিটি হরফকে মাখরাজ ও সিফাত অনুসারে বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করাকে তাজবিদ বলে।

আরবি হরফ কোনোটি মোটা করে পড়তে হয়, আবার কোনোটি চিকন করে পড়তে হয়। উচ্চারণের এ বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় সিফাত। যেমন: ت (তা) এবং ط (ত্বয়া) হরফ দুটির উচ্চারণের স্থান একই। কিন্তু এদের সিফাত ভিন্ন। এ দুটো হরফের মধ্যে ط (ত্বয়া)-কে মোটা করে পড়তে হয় এবং ت (তা)-কে চিকন করে পড়তে হয়। আবার মাখরাজ হলো উচ্চারণের স্থান। যেমন: ه (হা) এবং ح (হা) এখানে হরফ দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে উচ্চারণ করতে হয়। এভাবে মাখরাজ ও সিফাত ঠিক রেখে সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াত করাই তাজবিদ।

তাজবিদের গুরুত্ব

তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া ওয়াজিব বা আবশ্যক। তাজবিদ অনুসারে কুরআন না পড়লে গুনাহ হয়। এতে অনেক সময় আল-কুরআনের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। আর অশুদ্ধ তিলাওয়াতের ফলে সালাতও পূর্ণাঙ্গ হয় না। যেমন: সূরা ইখলাসে এসেছে– قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ – বলুন (হে নবি)! তিনি আল্লাহ; একক ও অদ্বিতীয়। এখানে قُلْ শব্দের অর্থ বলুন। আর যদি ق (ক্বাফ)-কে ভুল মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করে বলা হয় كُلْ তাহলে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। কেননা كُلْ শব্দের অর্থ খাও বা ভক্ষণ কর। ফলে আল-কুরআনের অর্থের বিকৃতি ঘটে। যা কোনোভাবেই জায়েজ নয়। তাজবিদ সহকারে শুদ্ধ ও সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝

অর্থ: "কুরআন আবৃত্তি করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।" (সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত: ৪)

তাজবিদ সহকারে কুরআন পড়া আল্লাহ পাকের নির্দেশ। আর শুদ্ধরূপে কুরআন শিক্ষার মাহাত্ম্য অনেক। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন—

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়।' (বুখারি)

সুতরাং আমরা তাজবিদ সহকারে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করব।

পাঠ ৪
মাখরাজ (اَلْمَخْرَجُ)

পরিচয়

মাখরাজ শব্দের অর্থ বের হওয়ার স্থান, উচ্চারণের স্থান। আরবি হরফসমূহ মুখের যে স্থান থেকে উচ্চারিত হয় সে স্থানকে মাখরাজ বলা হয়।

আরবি হরফ (বর্ণ) মোট ২৯টি। এগুলো মুখের মোট ১৭টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। এ ১৭টি স্থানকে বলা হয় মাখরাজ। মাখরাজ মোট ১৭টি।

১৭টি মাখরাজ আবার মুখের ৫টি স্থানে অবস্থিত। যথা– (১) মুখের খালি জায়গা বা জাওফ, (২) কণ্ঠনালি বা হলক, (৩) জিহ্বা, (৪) উভয় ঠোঁট এবং (৫) নাসিকামূল।

নিম্নে ছক আকারে কোন স্থানে কয়টি মাখরাজ অবস্থিত তা দেখানো হলো :

মুখের স্থান	মাখরাজ সংখ্যা
১. জাওফ বা মুখের খালি জায়গা	০১টি
২. হলক বা কণ্ঠনালি	০৩টি
৩. জিহ্বা	১০টি
৪. উভয় ঠোঁট	০২টি
৫. নাসিকামূল	০১টি

মাখরাজের বিস্তারিত বিবরণ

১। প্রথম মাখরাজ হলো জাওফ। জাওফ হলো মুখের ভিতরের খালি জায়গা। এ স্থান থেকে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। যথা—

ক. আলিফ (ا) যখন এর পূর্বের হরফে যবর থাকে। যেমন : بَا

খ. জযম বিশিষ্ট ওয়াও (وْ) যখন এর পূর্বের হরফে পেশ হয়। যেমন : بُوْ

গ. জযম বিশিষ্ট ইয়া (یْ) যখন এর পূর্বের হরফে যের হয়। যেমন : بِیْ

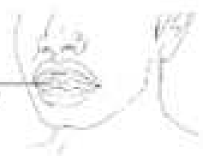

এ হরফ তিনটি মুখের খালি স্থান থেকে বাতাসের উপর উচ্চারিত হয়। এতে জিহ্বা, দাঁত, ঠোঁট, কন্ঠনালি কোনো কিছুরই ব্যবহার হয় না। এগুলোকে মাদ-এর হরফ বলা হয়। অর্থাৎ এগুলো পড়ার সময় এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

২। কন্ঠনালির নিম্নভাগ থেকে উচ্চারিত হয় দুটি হরফ। এ দুটি হলো–হামযা (ء) ও হা (ه)। যেমন : أَ أُ - إِ ءْ

৩। কন্ঠনালির মধ্যভাগ থেকে উচ্চারিত হয় দুটি হরফ। এ দুটি হলো–হা (ح) ও আইন (ع)। যেমন : أَحْ - أَعْ

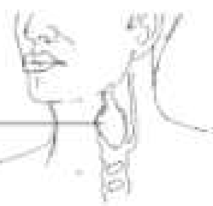

৪। কণ্ঠনালির উপরিভাগ থেকে উচ্চারিত হয় দুটি হরফ। এ দুটি হলো– খা (خ) ও গাইন (غ)।
যেমন : أَخْ - أَغْ

উপরিউক্ত ছয়টি হরফ কণ্ঠনালি বা হলক নামক স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। এজন্য এ ছয়টি হরফকে হরফে হলকি বা কণ্ঠবর্ণ বলা হয়।

৫। পঞ্চম মাখরাজ হলো জিহ্বার গোড়া এবং তার বরাবর উপরের তালু। এ স্থান থেকে একটি হরফ উচ্চারিত হয়। এটি হলো– ক্বাফ (ق)। যেমন : أَقْ

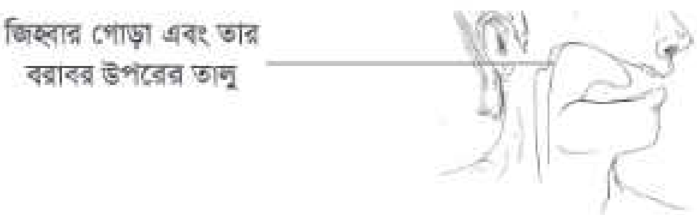

৬। জিহ্বার গোড়ার সামান্য উপরের অংশ এবং এর বরাবর উপরের তালু। এ স্থান থেকে কাফ (ك) হরফটি উচ্চারিত হয়। যেমন : أَكْ

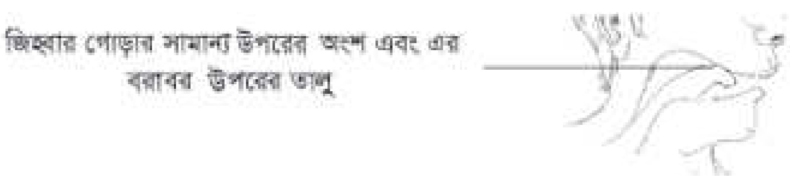

১০৫৪

৭। জিহ্বার মধ্যভাগ এবং এর সোজা উপরের তালু। এ মাখরাজ থেকে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। এগুলো হলো– জিম (ج), শিন (ش), ইয়া (ي)। যেমন : أَجْ- أَشْ - أَيْ

৮। অষ্টম মাখরাজ হলো জিহ্বার পার্শ্বভাগ ও উপরের পাটির দাঁতের মাড়ি। এ দুই-এর সংযোগে উচ্চারিত হয় দোয়াদ (ض) হরফটি।

এ হরফটি উচ্চারণে জিহ্বার পার্শ্বভাগকে ডান দিক অথবা বাম দিকের উপরের দাঁতের মাড়ির সাথে লাগিয়ে উচ্চারণ করা যায়। যেমন : أَضْ

৯। জিহ্বার অগ্রভাগের পাশ ও সামনের উপরের দাঁতের গোড়ার দিকের তালুর সাথে মিলে উচ্চারিত হয় একটি হরফ। এটি হলো– লাম (ل)। যেমন : أَلْ

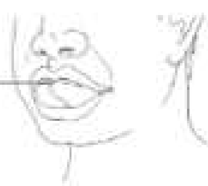

১০। জিহ্বার অগ্রভাগ ও তার বরাবর উপরের তালু। এ মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয় নুন (ن) হরফ।

যেমন : أَنْ

১১। জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ এবং সোজা উপরের তালু। এখান থেকে উচ্চারিত হয় রা (ر)। যেমন: أَرْ

১২। জিহ্বার অগ্রভাগ এবং সামনের উপরের দাঁতের গোড়া। এখান থেকে উচ্চারিত হয় তিনটি হরফ।

এগুলো হলো– তা (ت), দাল (د), ত্বয়া (ط)। যেমন : أَطْ - أَدْ - أَتْ

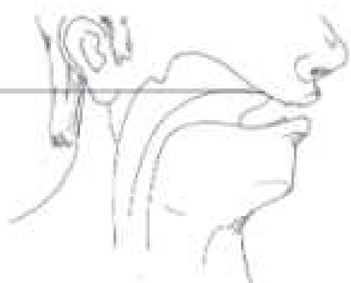

১৩। জিহ্বার অগ্রভাগ ও সামনের নিচের দুই দাঁতের মাথা এবং উপরের দাঁতের সামান্য অংশ মিলে উচ্চারিত হয় মোট তিনটি হরফ। এগুলো হলো– যা (ز), সিন (س), সোয়াদ (ص)। যেমন : أَضْ - أَسْ - أَزْ

১৪। জিহ্বার অগ্রভাগ ও সামনের উপরের বড় দুই দাঁতের মাথা। এখান থেকে উচ্চারিত হয় ছা (ث), যাল (ذ), যোয়া (ظ)। যেমন : أَظْ - أَذْ - أَثْ

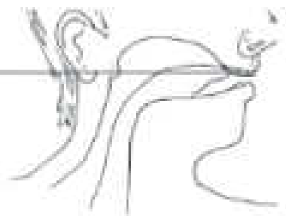

উপরিউক্ত দশটি (৫ থেকে ১৪ নম্বর পর্যন্ত) মাখরাজ জিহ্বার সাথে সংশ্লিষ্ট।

১৫। নিচের ঠোঁটের ভিতরের অংশ বা ভিজা অংশ এবং সামনের উপরের দুই দাঁতের মাথা। এ মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয় ফা (ف)। যেমন : أَفْ

১৬। দুই ঠোঁট। এখান থেকে উচ্চারিত হয় তিনটি হরফ। যথা–

ক. বা (ب) উচ্চারিত হয় নিচের ঠোঁটের ভিতরের অংশ থেকে। যেমন : أَبْ

খ. মীম (م) উচ্চারিত হয় ঠোঁটের বাইরের বা শুষ্ক অংশ থেকে। যেমন : أَمْ

গ. ওয়াও (واو) এ হরফ উচ্চারণে দুই ঠোঁট সরাসরি মিলিত হয় না। বরং উভয় ঠোঁট ডান ও বাম পাশ থেকে গোল হয়ে অর্ধফোটা ফুলের মতো মধ্যস্থলে ছিদ্র রেখে উচ্চারিত হয়। যেমন : أَوْ

দুই ঠোঁট

১৭। শেষ মাখরাজ হলো নাসিকামূল। এখান থেকে গুন্নাহসমূহ উচ্চারিত হয়। যেমন : জযমযুক্ত নুনকে কখনো কখনো গোপন করে নাসিকামূল থেকে উচ্চারণ করা হয়। তাশদিদযুক্ত নুনের মাখরাজও এটিই। যেমন : مِنْ شَرِّ - إِنَّ

নাসিকামূল

তাজবিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হলো মাখরাজ। হরফ (বর্ণ)-সমূহকে নিজ নিজ মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) থেকে উচ্চারণ করা আবশ্যক। সুতরাং আমরা হরফগুলোর মাখরাজ শিখব ও নিয়মিত অনুশীলন করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা –

ক. আরবি ২৯টি বর্ণ লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

খ. ১৭টি মাখরাজের একটি তালিকা তৈরি করবে।

নতুন শব্দ পরিচয়

লাওহি মাহফুয — সংরক্ষিত ফলক।

হিদায়াত — দিকনির্দেশনা। সত্য দীনের প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান।

হরফ — বর্ণ।

নুকতা — আরবি বর্ণসমূহের উপরে, নিচে বা মধ্যে ব্যবহৃত বিন্দু বা ফোঁটাকে নুকতা বলে। যেমন : ن - ب - ت

হরকত — যবর, যের, পেশকে হরকত বলে।

আয়াত — আল-কুরআনের এক একটি বাক্যকে বলা হয় আয়াত।

জিবরাইল (আ.) — প্রধান ফেরেশতাগণের একজন। তিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী নিয়ে নবি-রাসুলগণের নিকট আসতেন।

মু'জিযা — অলৌকিক ঘটনা বা বস্তু। নবি-রাসুলগণের দ্বারা প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনা ও বস্তুকে মু'জিযা বলা হয়।

নাজিল — অবতীর্ণ।

কালাম — বাণী।

সাহাবা — হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথীগণ। যাঁরা মহানবি (স.)-কে ইমানসহ দেখেছেন এবং ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা হলেন সাহাবা।

নফল — ঐচ্ছিক, ফরজের অতিরিক্ত।

জায়েজ — বৈধ, অবৈধের বিপরীত।

অর্থ ও পটভূমিসহ আল-কুরআনের কতিপয় সূরা

পাঠ ৫

সূরা আল-ফাতিহা (سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ)

আল-কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা হলো আল-ফাতিহা। ফাতিহা শব্দের অর্থ ভূমিকা, মুখবন্ধ, দ্বার উন্মোচনকারী ইত্যাদি। যেহেতু এ সূরার মাধ্যমে কুরআনুল কারিম শুরু করা হয়, সেজন্য এ সূরার নাম আল-ফাতিহা। একে ফাতিহাতুল কিতাব বা ফাতিহাতুল কুরআনও বলা হয়। অর্থাৎ কিতাব বা কুরআনের ভূমিকা।

এ সূরাটি মাক্কি সূরা। অর্থাৎ রাসুল (স.)-এর হিজরতের পূর্বে এ সূরাটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে এ সূরাই প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা সর্বমোট ৭টি। সূরা আল-ফাতিহা কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এর বহু নাম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

১. সূরাতুল হামদ (প্রশংসার সূরা) : এ সূরায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা হয়েছে।

২. উম্মুল কুরআন (কুরআনের জননী) : এ সূরা পবিত্র কুরআনের সারসংক্ষেপস্বরূপ।

৩. সূরাতুস সালাত (সালাতের সূরা) : সালাতের শুরুতে এ সূরা পাঠ করা অপরিহার্য। এ সূরা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না।

৪. সূরাতুশ শিফা (রোগমুক্তির সূরা) : এ সূরার মাধ্যমে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৫. সূরাতুদ্ দোয়া (দোয়া বা প্রার্থনামূলক সূরা) : এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা নিবেদন করা হয়।

শব্দার্থ

اَلْحَمْدُ	—	সকল প্রশংসা।	نَعْبُدُ	—	আমরা ইবাদত করি।
رَبِّ	—	রব, প্রতিপালক।	نَسْتَعِيْنُ	—	আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।
اَلْعٰلَمِيْنَ	—	সমগ্র সৃষ্টিজগৎ, জগৎসমূহ।	اِهْدِنَا	—	আমাদের পথ দেখাও।
مٰلِكِ	—	মালিক, অধিপতি।	صِرَاطَ	—	পথ, রাস্তা।
يَوْمِ الدِّيْنِ	—	বিচার দিবস, কর্মফল দিবস।	اَنْعَمْتَ	—	তুমি অনুগ্রহ করেছ।
اِيَّاكَ	—	শুধু তোমরাই।	اَلْمَغْضُوْبِ	—	ক্রোধ-নিপতিত।
			اَلضَّآلِّيْنَ	—	পথভ্রষ্ট।

২০২৫

অনুবাদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ

১. সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই।

الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ

২. যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ

৩. যিনি বিচার দিনের মালিক।

اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ ؕ

৪. আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য চাই।

اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۙ

৫. আমাদের সরল পথ দেখাও।

صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ ۬ۙ

৬. তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ।

غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ○

৭. তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।

ব্যাখ্যা

সূরা আল-ফাতিহা আল-কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এ সূরায় সম্পূর্ণ কুরআনের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা হয়েছে। এর প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে। শেষ তিনটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালার নিকট মানুষের মুনাজাত ও প্রার্থনার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। আর মধ্যবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও দোয়া একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। কেননা তিনিই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনিই বিশ্বজগতের মালিক ও প্রতিপালক। সৃষ্টিজগতের সবকিছুই তার রহমত ও করুণায় লালিতপালিত হয়। তার নিয়ামত সকলেই ভোগ করে। তাছাড়া তিনি শুধু ইহকালের মালিক নন, বরং তিনি পরকালেরও মালিক। কিয়ামত, হাশর, মিযান, জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছুই তার অধীন। শেষ বিচারের দিনে তিনিই একমাত্র বিচারক। তিনিই নিজ ক্ষমতায় পুণ্যবানদের পুরস্কার ও পাপীদের শাস্তি দেবেন। সুতরাং সকল প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তারই প্রাপ্য। এতে তার কোনো অংশীদার নেই।

এই সূরার প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন কুদরত ও ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে এবং মধ্যবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ শুধু তাঁরই ইবাদত করবে এবং তারই নিকট সাহায্য চাইবে। কেননা তিনিই ইবাদতের যোগ্য। আর তিনি ব্যতীত সাহায্যকারী কেউ নেই।

এ সূরার শেষ তিন আয়াতে আল্লাহ তায়ালার নিকট মানুষের প্রার্থনা ও মুনাজাত বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু মহান আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক। সুতরাং সঠিক পথ একমাত্র তিনিই দেখাতে পারেন। তিনিই ভালো জানেন কোন পথ সঠিক আর কোন পথ ভ্রান্ত। অতএব, মানুষের উচিত তার নিকট সত্যপথের সন্ধান প্রার্থনা করা। যে পথ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ, নবি-রাসুলগণ অনুসরণ করেছেন সে পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর নিকট মুনাজাত করা। আর যে পথে অভিশপ্ত, পথভ্রষ্টরা পরিচালিত হয়েছে সে পথ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

নৈতিক শিক্ষা

আল্লাহ তায়ালা একক, অদ্বিতীয় ও সকল কিছুর মালিক। বিশ্বজগতের সকল প্রশংসা তারই প্রাপ্য। তিনিই মানুষকে সরল, সঠিক পথের সন্ধান দেন। সুতরাং আমরা সকাল-সন্ধ্যায় তার প্রশংসা করব। সবসময় তাঁর ইবাদত করব। আর আমাদের সকল সঠিক পথের সন্ধান দানের জন্য তার নিকটই প্রার্থনা জানাব। সাথে সাথে পথভ্রষ্ট ও অন্যায়কারীদের আচরণ অনুসরণ থেকে আমরা বিরত থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা পাশের বন্ধুকে সূরা ফাতিহা অর্থসহ শোনাবে।

পাঠ ৬
সূরা আন-নাস (سُوْرَةُ النَّاسِ)

আল-কুরআনের সর্বশেষ সূরা হচ্ছে সূরা আন-নাস। এটি পবিত্র কুরআনের ১১৪তম সূরা। এ সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা ৬টি।

এ সূরায় اَلنَّاسُ (আন-নাস) শব্দটি মোট পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে। সূরায় ব্যবহৃত এ اَلنَّاسُ শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। সূরা আল-ফাতিহায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা হয়েছে। তারপর তার নিকট সরল পথের সন্ধান চাওয়া হয়েছে। অতঃপর কুরআনের অন্যান্য সূরায় মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শয়তান মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিরত রাখতে চায়। তাই সবশেষে এ সূরায় আল্লাহ পাকের নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়। এভাবে কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়েছে।

শব্দার্থ

قُلْ	—	আপনি বলুন; তুমি বলো।
اَعُوْذُ	—	আমি আশ্রয় চাই, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমি শরণ নেই।
رَبِّ	—	রব, প্রতিপালক।
اَلنَّاسِ	—	মানুষ, মানবজাতি।
مَلِكِ	—	মালিক, অধিপতি।
اِلٰهِ	—	মাবুদ, উপাস্য।
شَرِّ	—	অনিষ্ট, ক্ষতি।
اَلْوَسْوَاسِ	—	কুমন্ত্রণাদাতা।
اَلْخَنَّاسِ	—	আত্মগোপনকারী (শয়তান)।
يُوَسْوِسُ	—	সে কুমন্ত্রণা দেয়।
صُدُوْرِ	—	বক্ষসমূহ, অন্তরসমূহ।
اَلْجِنَّةِ	—	জিন।

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ

১. আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের নিকট।

مَلِكِ النَّاسِ ۙ

২. মানুষের অধিপতির নিকট।

اِلٰهِ النَّاسِ ۙ

৩. মানুষের ইলাহ এর নিকট।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ○

৪. আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতা (শয়তান)-এর অনিষ্ট থেকে।

الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ

৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে।

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۙ

৬. জিন এবং মানুষের মধ্য থেকে।

ব্যাখ্যা

সূরা আন-নাস-এর আয়াতসমূহে দুই প্রকারের আলোচনা রয়েছে। প্রথম তিন আয়াতে মহান আল্লাহর তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো রব, মালিক ও ইলাহ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালাই মানুষের রব, মালিক ও ইলাহ্। তিনি ব্যতীত আর কেউ এ তিনটি গুণের অধিকারী নয়। মানুষ হলো তার বান্দা। সুতরাং মানুষের উচিত সর্বাবস্থায় আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া। এভাবে সূরার প্রথম অংশে আল্লাহ্ তায়ালার তিনটি গুণের উল্লেখ করে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

সূরার দ্বিতীয় অংশে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মহান আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা হয়েছে। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। সে গোপনে, প্রকাশ্যে, ঘুমন্ত অবস্থায়, জাগ্রত অবস্থায় সবসময় মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। তার কাজই হলো কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষের অন্তরকে বিপথগামী করা। মানুষ যেন আল্লাহ্ তায়ালাকে ভুলে যায়, তার ইবাদত না করে ইত্যাদি কুমন্ত্রণা শয়তান দিয়ে থাকে। শয়তান শুধু জিনই নয় বরং মানুষের মধ্যেও শয়তান রয়েছে। মানুষ শয়তানও অন্যকে প্রতারিত করে, দীন থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। এসব শয়তান থেকে আল্লাহ্ তায়ালার আশ্রয় ব্যতীত বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এজন্য এ সূরায় শয়তানের সকল কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক শিক্ষা

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের প্রতিপালক। তিনিই আমাদের মাবুদ। আমাদের সকল কিছুই তার দান। তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের প্রকৃত অধিপতি। সুতরাং তার আদেশ-নিষেধ আমরা সবসময় মেনে চলব। আর শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকব। কেননা শয়তান মানুষকে অন্যায়, অনৈতিক ও অশ্লীল কাজের দিকে পরিচালনা করে। ফলে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকতে পারলে অনৈতিক কাজ থেকেও বেঁচে থাকা যাবে।

কাজ : শিক্ষার্থী পাশের বন্ধুকে সূরা আন-নাসের অর্থ ও নৈতিক শিক্ষা শোনাবে।

পাঠ ৭
সূরা আল-ফালাক্ব (سُوْرَةُ الْفَلَقِ)

সূরা আল-ফালাক্ব আল-কুরআনের ১১৩তম সূরা। এটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরার আয়াত সংখ্যা ৫টি। এ সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ হলো اَلْفَلَقِ (ফালাক্ব)। এ শব্দ থেকেই এ সূরার নাম সূরা আল-ফালাক্ব রাখা হয়েছে।

সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন-নাস-এর মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ সূরা দুটিতে বিভিন্ন জিনিসের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। এ সূরা দুটি নাজিলের কারণ নিম্নরূপ :

একবার লাবীদ ইবনুল আ'সাম নামক এক ইহুদি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর উপর জাদু করে। এ কাজে সে তার কন্যাদের সাহায্য নেয়। তারা গোপনে রাসুল (স.)-এর একটি পবিত্র চুল সংগ্রহ করে এবং তাতে এগারোটি গিরা দিয়ে জাদু করে। ফলে রাসুল (স.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। জাদুর কারণে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কষ্ট হতে থাকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা এ সূরা দুটি নাজিল করেন। এ সূরা দুটিতে মোট ১১টি আয়াত রয়েছে। প্রতিটি আয়াত পড়ে প্রতিটি গিরাতে ফুঁক দিলে জাদুর প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। রাসুল (স.) সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

শব্দার্থ

اَلْفَلَقِ	—	প্রভাত, ঊষা।	وَقَبَ	—	গভীর হলো, আচ্ছন্ন হলো।
مِنْ	—	হতে, থেকে।	النَّفّٰثٰتِ	—	ফুঁক দানকারী নারীগণ।
خَلَقَ	—	তিনি সৃষ্টি করেছেন।	الْعُقَدِ	—	গ্রন্থিসমূহ, গিরাসমূহ।
غَاسِقٍ	—	রাতের অন্ধকার।	حَاسِدٍ	—	হিংসাকারী, হিংসুক।
إِذَا	—	যখন।	حَسَدَ	—	সে হিংসা করল।

অনুবাদ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۝۱

১. আপনি বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি প্রভাতের স্রষ্টার নিকট।

مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲

২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।

وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝۳

৩. রাতের আঁধারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা গভীর হয়।

وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۝۴

৪. এবং অনিষ্ট থেকে ঐ সমস্ত নারীদের, যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।

وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝۵

৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় আল্লাহ তায়ালার নিকট অনিষ্টকর বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এর প্রথম আয়াতে উষার রব আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। মূলত আল্লাহ পাক সকল শক্তির উৎস। বিশ্বজগতের সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে রূপান্তর করেন। তিনিই সকাল, সন্ধ্যা, উষা ইত্যাদির আগমন ঘটান। সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে তিনিই রক্ষা করেন। এজন্য সূরার প্রথমেই আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সবকিছুরই স্রষ্টা। এসব সৃষ্টির মধ্যে অনেক হিংস্র, বিষাক্ত ও অনিষ্টকর সৃষ্টিও রয়েছে। এগুলো মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলোর অনিষ্ট থেকে রক্ষাকর্তা হলেন মহান আল্লাহ। গভীর রাতে নানারূপ বিপদাপদ ঘটতে পারে। যেমন: জিন, শয়তান, চোর, ডাকাত, শত্রুর আক্রমণ ইত্যাদি। এসবের অনিষ্ট থেকেও রক্ষাকর্তা মহান আল্লাহ। তাছাড়া জাদুকর নরনারী ও হিংসুকের হিংসা থেকে আশ্রয়দাতাও আল্লাহ তায়ালা। আয়াতগুলোতে উল্লিখিত সমুদয় বিষয় থেকে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

নৈতিক শিক্ষা

আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রভু। তিনিই সকল কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। সুতরাং সকল বিপদে-আপদে আমরা তাঁরই নিকট সাহায্য চাইব। সব ধরনের অনিষ্ট থেকে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করব। সাথে সাথে হিংসা, জাদু-টোনা, অপরের ক্ষতিসাধন ইত্যাদি কাজ থেকে আমরা নিজেরা বিরত থাকব।

পাঠ ৮
সূরা আল-হুমাযাহ (سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ)

সূরা আল-হুমাযাহ আল-কুরআনের ১০৪তম সূরা। এ সূরাটি পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা ৯টি। এ সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হুমাযাহ অনুসারে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আমরা এ সূরাটি অর্থসহ মুখস্থ করব এবং এ সূরার শিক্ষা অনুযায়ী আমল করব।

শব্দার্থ

وَيْلٌ	—	দুর্ভোগ, ধ্বংস।	كَلَّا	—	কখনো নয়।
كُلِّ	—	প্রত্যেক, সকল।	لَيُنْۢبَذَنَّ	—	অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে।
هُمَزَةٍ	—	পশ্চাতে নিন্দাকারী।	الْحُطَمَةِ	—	হুতামাহ, একটি জাহান্নামের নাম।
لُمَزَةِ	—	সম্মুখে নিন্দাকারী।	مَآ اَدْرٰىكَ	—	আপনি কি জানেন?
جَمَعَ	—	সে জমা বা একত্র করেছে, সে সঞ্চয় করেছে।	نَارُ	—	আগুন।
مَالًا	—	মাল, ধনসম্পদ।	تَطَّلِعُ	—	তা গ্রাস করবে।
عَدَّدَهٗ	—	সে বারবার গণনা করেছে।	الْاَفْـِٕدَةِ	—	হৃদয়সমূহ, অন্তরসমূহ।
يَحْسَبُ	—	সে ধারণা করে, সে হিসাব করে।	مُّؤْصَدَةٌ	—	পরিবেষ্টিত।
اَخْلَدَهٗ	—	তা অমর করেছে, তা চিরস্থায়ী করেছে।	عَمَدٍ	—	স্তম্ভসমূহ, খুঁটিসমূহ।
			مُّمَدَّدَةٍ	—	দীর্ঘায়িত, প্রলম্বিত।

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ○

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে।

الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ○

২. যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে।

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ○

৩. সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে।

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ○

৪. কখনো না; সে অবশ্যই হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে।

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ○

৫. আর আপনি কি জানেন, হুতামাহ কী?

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ○

৬. এটি আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন।

الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ○

৭. যা অন্তরসমূহ গ্রাস করবে।

اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ○

৮. নিশ্চয়ই এটি তাদের পরিবেষ্টন করে রাখবে।

فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ○

৯. দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

শানে নুযুল

উমাইয়া ইবনু খালফ, ওলীদ ইবনু মুগিরা ও আখনাস ইবনু শুরায়ক মহানবি (স.) ও মুমিনদের গিবত করত এবং তাদের অর্থলিপ্সা ছিল প্রবল। তাদের এই অপকর্মের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ এই সূরা অবতীর্ণ করেন।

ব্যাখ্যা

সূরা আল-হুমাযাহকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম তিন আয়াত নিয়ে প্রথম অংশ এবং শেষ ছয়টি আয়াত নিয়ে দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশে তিনটি জঘন্য গুনাহের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে এসব গুনাহের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

এ সূরায় বর্ণিত গুনাহ বা পাপ কাজগুলো হলো—

ক. পশ্চাতে বা গোপনে কারো নিন্দা করা। একে গিবতও বলা হয়। এটি অত্যন্ত খারাপ কাজ। আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনের অন্য আয়াতে গিবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমান বলে উল্লেখ করেছেন।

খ. সামনাসামনি কারো নিন্দা করা। গোপনে নিন্দা করার মতো এটাও অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এর ফলে মানুষ অপমানিত হয়। অনেক সময় মানুষের মধ্যে ঝগড়াফ্যাসাদ ও মারামারির সৃষ্টি হয়।

গ. ধনসম্পদ জমা করা ও বারবার তা গণনা করা। একে এক কথায় অর্থলিপ্সা বা আয়ের লোভ বলা যায়। ধনসম্পদের প্রতি লোভী হলে মানুষ নানা অবৈধ পথে উপার্জন করতে থাকে। সে কৃপণ হয়ে পড়ে। গরিব-দুঃখীদের অধিকার আদায় করে না। যাকাত, হজ ইত্যাদি ফরজ ইবাদতও পালন করে না। বরং সে সম্পদ জমা করতে থাকে এবং ধারণা করে যে, এসব ধনসম্পদ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে।

এ সূরার দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত তিনটি জঘন্য কাজের শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। গিবত, পরনিন্দা ও অর্থলিপ্সা তিনটিই খারাপ কাজ। এগুলো কবিরা গুনাহ। এজন্য আখিরাতে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। অর্থ মানুষকে অমর করে রাখবে এ ধারণাও ঠিক নয়। বরং সকল মানুষকেই মরতে হবে। তারপর হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের হিসাব নেবেন। যারা দুনিয়াতে এ তিনটি জঘন্য কাজ করে আখিরাতে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের স্থান হবে হুতামাহ নামক জাহান্নামে। হুতামাহর আগুনে ঐ সকল ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বলবে। এমনকি তাদের হৃদয় বা অন্তরও ঐ আগুনে পুড়বে। কোনো কিছুই আগুনের গ্রাস থেকে রেহাই পাবে না।

নৈতিক শিক্ষা

সূরা আল-হুমাযাহ-এর নৈতিক শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।এখানে তিনটি মারাত্মক গুনাহের বা পাপ কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো গিবত তথা পশ্চাতে বা গোপনে কারো নিন্দা করা, সামনাসামনি নিন্দা করা ও অর্থলিপ্সা। এ তিনটিই নীতিহীন কাজ, অনৈতিক কাজ। উত্তম চরিত্রবান লোক এসব কাজ করতে পারে না। বরং নীতিবান হতে হলে এসব দোষ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। অতএব, আমরাও এসব দোষ থেকে বেঁচে থাকব। কখনো কারো নিন্দা করব না। আর অর্থের প্রতি লোভ করব না। বরং আল্লাহ তায়ালা যে ধনসম্পদ দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকব এবং প্রয়োজনমতো তা খরচ করব।

পাঠ ৯

সূরা আল-আসর (سُوْرَةُ الْعَصْرِ)

সূরা আল-আসর আল-কুরআনের ১০৩তম সূরা। এটি মক্কা শরিফে অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা মাত্র ৩টি। এ সূরার প্রথমে আল্লাহ তায়ালা আসর বা মহাকালের শপথ করেছেন। এজন্য এ সূরার নাম রাখা হয়েছে আল-আসর।পবিত্র কুরআনের ছোট সূরাসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। তবে এ সূরার তাৎপর্য অত্যন্ত

ব্যাপক। ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেছেন, 'যদি মানুষ কেবল এ সূরাটি নিয়ে চিন্তা করত, তবে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।' (ইবনে কাসির)। অর্থাৎ এ সূরার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে পারলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের পথ লাভ করত। সুতরাং আমরা এ সূরাটি অর্থসহ শিখব। অতঃপর এর তাৎপর্য শিক্ষা করব এবং তদানুযায়ী আমল করব।

শব্দার্থ

وَ	–	শপথ, কসম।
الْعَصْرِ	–	সময়, যুগ, কাল, মহাকাল।
اِنَّ	–	নিশ্চয়ই, অবশ্যই।
اَلْاِنْسَانَ	–	মানুষ।
خُسْرٍ	–	ক্ষতি।
اِلَّا	–	ব্যতীত, ছাড়া।
اَلَّذِيْنَ	–	যারা।
اٰمَنُوْا	–	তারা ইমান এনেছে।
وَعَمِلُوا	–	তারা আমল করেছে।
الصّٰلِحٰتِ	–	সৎকর্মসমূহ।
وَتَوَاصَوْا	–	তারা পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে।
اَلْحَقِّ	–	সত্য।
اَلصَّبْرِ	–	ধৈর্য।

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالْعَصْرِ ۙ○

১. মহাকালের শপথ।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۙ○

২. নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۙ○

৩. কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

শানে নুযূল

ওলীদ ইবনু মুগিরা, আস ইবনু ওয়াইল, আসওয়াদ ইবনু মুত্তালিব প্রমুখ মুশরিক বলত যে, মুহাম্মদ (স.) অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে (তাদের কথার অসারতা প্রমাণ করে) আল্লাহ্ তায়ালা সূরাটি নাজিল করেন।

ব্যাখ্যা

সূরা আল-আসরের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ্ তায়ালা সময় বা মহাকালের শপথ করেছেন। মানুষের জীবনে সময় অত্যন্ত মূল্যবান। কেননা দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ সময়ের মধ্যেই মানুষকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। যারা দুনিয়াতে সময়ের সদ্ব্যবহার করবে এবং নেক আমল করবে পরকালে তারাই সফলতা লাভ করবে। তাই সময়ের শপথ করে মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের স্বাভাবিক অবস্থার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তারা সময়ের সদ্ব্যবহার করে না, আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে না। যারা এরূপ মনগড়াভাবে জীবনযাপন করবে তারা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তৃতীয় ও শেষ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য চারটি আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যে যারা এ চারটি কাজ করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বরং তারা সফলতা লাভ করবে। আর যারা দুনিয়াতে এ কাজগুলো করবে না তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কাজগুলো হলো ঈমান আনা, সৎকর্ম করা, সত্যের উপদেশ দেওয়া ও ধৈর্যধারণের উপদেশ দেওয়া।

এ কাজগুলোর প্রথম দুটি কাজ ব্যক্তিগত। অর্থাৎ প্রথমে ঈমান আনতে হবে। তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এরপর দ্বিতীয় কাজ হলো ভালো কাজ করা। আল্লাহ্ তায়ালা যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন তা পালন করতে হবে। আর তিনি যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এভাবে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য করার নামই নেক কাজ।

চারটি কাজের মধ্যে শেষের কাজ দুটি সামাজিক। অর্থাৎ একা একা এ কাজ দুটি করা যাবে না। এর প্রথমটি হলো-সমাজের মানুষকে সত্যের উপদেশ দেওয়া। অর্থাৎ মানুষকে সত্যপথের দিকে ডাকা। তাদের নেক কাজে উৎসাহিত করা, অন্যায় কাজ থেকে তাদের বিরত রাখা ইত্যাদি। সামাজিক দায়িত্বের শেষটি হলো মানুষকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেওয়া। বিপদ-আপদ, দুঃখকষ্ট আল্লাহ্ তায়ালারই দান। এগুলোর মাধ্যমে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে হতাশ ও নিরাশ হওয়া যাবে না। বরং ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। এভাবে পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

নৈতিক শিক্ষা

আমরা সবাই সফলতা লাভ করতে চাই। কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হতে চাই না। সুতরাং আমরা ইমান আনব এবং নেক কাজ করব। কোনো প্রকার অন্যায়-অত্যাচার ও অনৈতিক কাজ করব না। সাথে সাথে আমরা আমাদের বন্ধুবান্ধব, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে সত্য ও সুন্দরের দিকে আহবান করব। সবাইকে উত্তম চরিত্রবান ও নীতিবান হতে উৎসাহ দেবো। বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ করব। হতাশ হয়ে কখনো অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করব না।

কাজ : ক্লাসের সব শিক্ষার্থী দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে। একদল সূরা আল-আসর অর্থসহ মুখস্থ বলবে। অন্যদল এ সূরার ব্যাখ্যা ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে বলবে। একইভাবে দ্বিতীয় দল প্রথম কাজটি এবং প্রথম দল পরের কাজটি করবে।

পাঠ ১০
অর্থসহ মুনাজাতের তিনটি আয়াত

পৃথিবীতে চলার জন্য আমাদের নানা জিনিসের প্রয়োজন। এসব জিনিস পাওয়ার জন্য আমরা বহু কষ্ট করি। আল্লাহ তায়ালার দয়া ব্যতীত কোনো কিছুই আমরা লাভ করতে পারি না। মহান আল্লাহ আমাদের রব। তিনিই সবকিছু আমাদের দান করেন। দুনিয়া-আখিরাতের সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ তায়ালারই দান। সুতরাং কোনো কিছু পাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকটই প্রার্থনা করা উচিত। আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনাকেই মুনাজাত বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আমাদের মুনাজাত করার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। আল-কুরআনে মুনাজাতমূলক বহু আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র তিনটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো। আমরা এসব আয়াত শিখব ও অর্থ জানব। এরপর এগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করব।

আয়াত ১

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

অর্থ : "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও। আর আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২০১)

দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ নয়। এরপর রয়েছে আখিরাত। আখিরাত হলো চিরস্থায়ী। এর শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এ দুটি জীবনে কল্যাণ লাভ করাই হলো প্রকৃত সফলতা। দুনিয়ার জীবনে আমরা সুখ-শান্তি চাই। আর আখিরাতে চাই মুক্তি ও সফলতা। পরকালে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া হলো সবচেয়ে বড় সফলতা। আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে এ সমস্ত কল্যাণ ও সফলতা। আল্লাহ তায়ালা এগুলো মানুষকে দান করেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাব। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ শিক্ষাই প্রদান করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ লাভের জন্য এ দোয়াটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আয়াত ২ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ○

অর্থ : "হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর। যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালনপালন করেছেন।"(সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৪)

মাতাপিতা সন্তানের অতি আপনজন। তাঁরা অত্যন্ত আদর-স্নেহে সন্তানকে লালনপালন করেন। নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ান। নিজেরা কষ্ট করে সন্তানকে আরাম-আয়েশে রাখেন। বিশেষ করে শৈশবকালে তাঁরা আমাদের খুব যত্নের সাথে প্রতিপালন করেন। শিশুকালে সকল মানুষই অসহায় থাকে। নিজে নিজে দাঁড়াতে পারে না, খেতে পারে না, চলাফেরা করতে পারে না। এমনকি কথাবার্তাও বলতে পারে না। মাতাপিতাই এ সময় মানুষের সবচেয়ে বড় অবলম্বন। তাঁরাই এ সময় সন্তানকে মায়া-মমতা দিয়ে বড় করে তোলেন। অতএব, আমাদের সকলের কর্তব্য মাতাপিতার আনুগত্য করা। তাঁদের কথা মেনে চলা। তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দোয়া করা। এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ মাতাপিতার জন্য দোয়া করার বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা এ আয়াত অর্থসহ শিখব। অতঃপর আন্তরিকভাবে এ আয়াত পড়ে মহান আল্লাহর নিকট আমাদের মাতাপিতার জন্য দোয়া করব। তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের কল্যাণ ও রহমত দান করবেন।

আয়াত ৩

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ○

অর্থ : "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর।" (সূরা তা-হা, আয়াত : ১১৪)

উক্ত আয়াতে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মুনাজাত করার কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। কেননা শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে চিনতে পারি। তার বিধান ও বাণী জানতে পারি। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আমরা মানুষের মতো মানুষ হই। জীবনে উন্নতি লাভের জন্যও জ্ঞানার্জন করা জরুরি। সুতরাং আমরা ভালো করে লেখাপড়া শিখব। জ্ঞানার্জনে কোনোরূপ অবহেলা করব না। আর সাথে সাথে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট মুনাজাত করব। কেননা মহান আল্লাহই সবকিছুর মালিক। তিনিই মানুষকে জ্ঞান দান করেন। অতএব, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তাঁর নিকটই প্রার্থনা করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সম্মিলিতভাবে দুই হাত তুলে মুনাজাতমূলক আয়াত তিনটি অর্থসহ মুখস্থ বলবে।

পাঠ ১১

আল-হাদিস (اَلْحَدِيْثُ)

হাদিস আরবি শব্দ। এর অর্থ কথা, বাণী ইত্যাদি। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বাণী, কাজ ও অনুমোদনকে হাদিস বলা হয়। অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবি (স.) যা কিছু বলতেন তা-ই হাদিস।

তিনি যে সমস্ত কাজ করেছেন তাও হাদিস। আর যে সমস্ত কাজ সাহাবিগণ তাঁর সামনে করেছেন কিন্তু তিনি তাঁদের নিষেধ করেননি বরং ঐ সমস্ত কাজে মৌনসম্মতি দিয়েছেন এগুলোও হাদিস। হাদিসের অপর নাম হলো সুন্নাহ।

সাহাবিগণ রাসুল (স.)-এর সবরকম হাদিসই সংরক্ষণ করতেন। রাসুল (স.) কিছু বললে সাথে সাথে তাঁরা তা মুখস্থ করতেন। নবি করিম (স.) যে কাজ যেভাবে করতেন সাহাবিগণও তা ঠিক তেমনিভাবে আদায় করতেন। অতঃপর নিজ পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধবগণের নিকট এগুলো পৌঁছে দিতেন। এভাবে মহানবি (স.)-এর জীবদ্দশায় হাদিস সংরক্ষণ করা হয়। নবি করিম (স.)-এর ইন্তিকালের পর সাহাবিগণ মজলিস করে হাদিস শিক্ষা দিতেন। দূরদূরান্ত থেকে লোকজন তাঁদের নিকট হাদিস শিখতে আসতেন। পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসগণ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সকল হাদিস লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তাঁরা হাদিসের বহু কিতাব সংকলন করেন। এভাবে আমরাও নবি কারিম (স.)-এর হাদিস লাভ করি।

হাদিসের গুরুত্ব

ইসলামে হাদিসের স্থান অত্যন্ত ঊর্ধ্বে। ইসলামি জীবনব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস হলো হাদিস। আর এর প্রথম উৎস হলো আল-কুরআন। সুতরাং ইসলামে আল-কুরআনের পরই হাদিসের স্থান। হাদিস হলো আল-কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নানা নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর নবি করিম (স.) হাদিসের মাধ্যমে তা মানুষের নিকট বিশ্লেষণ করেছেন। নিচের উদাহরণটি পড়লে আমরা স্পষ্টভাবে বিষয়টি বুঝতে পারব। যেমন: আল-কুরআনে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীভাবে আমরা সালাত আদায় করব তা বলে দেওয়া হয়নি। একাকী পড়ব না-কি সকলে মিলে পড়ব, কত রাকআত পড়ব, কোন সময় পড়ব, রুকু-সিজদাহ্ কীভাবে করব ইত্যাদি কিছুই কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। এগুলো আমরা হাদিসের মাধ্যমে পাই। রাসুলুল্লাহ (স.) এসব নিয়মকানুন আমাদের বলে দিয়েছেন। তিনি নিজে সালাত আদায় করে আমাদের হাতেকলমে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর হাদিস না থাকলে আমরা তা কখনোই জানতে পারতাম না। সুতরাং কুরআনের পরই হাদিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন আল্লাহ্ তায়ালার প্রেরিত রাসুল। তিনি ছিলেন মানবজাতির জন্য আদর্শ। তাঁর মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ্ তায়ালার পরিচয় লাভ করি। তিনি আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশেই আমাদের সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিতেন। মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতেন। তাঁর এসব আদেশ-নিষেধই হলো হাদিস।

পবিত্র হাদিস আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেছেন, "রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত : ৭)

অতএব, রাসুল (স.)-এর হাদিস আমরা পাঠ করব। তার অর্থ বুঝব এবং সে অনুযায়ী আমল করব। তাঁর আদেশগুলো মেনে চলব এবং নিষেধগুলো থেকে বিরত থাকব।

পাঠ ১২
অর্থসহ নৈতিক গুণাবলি বিষয়ক দুটি হাদিস

নীতি ও নৈতিকতা মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য। নীতি হলো কথায় ও কাজে সৎ, সুন্দর ও মার্জিত হওয়া। কোনোরূপ অন্যায়, অত্যাচার ও অশালীন কাজকর্ম না করা। নীতিহীন মানুষ পশুর সমান। যে ব্যক্তি চলাফেরা ও কথাবার্তায় নীতির অনুসরণ করে না, সমাজের সকলে তাকে ঘৃণা করে। অন্যদিকে নীতিবান মানুষকে সবাই ভালোবাসে। সকলে তাকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বোত্তম নীতির অধিকারী। তিনি সর্বদা নীতি ও আদর্শের অনুশীলন করতেন। উত্তম চরিত্র ও নীতির জন্য শত্রুরাও তাঁর প্রশংসা করত।

হাদিসসমূহে আমরা দেখতে পাই মহানবি (স.) উম্মতগণকেও নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছেন। নিম্নে দুটি নীতিমূলক হাদিস উল্লেখ করা হলো। আমরা এগুলো মুখস্থ করব, এর অর্থ জানব। আমরা এ নীতিমূলক হাদিস অনুযায়ী আমল করব।

হাদিস ১

لَا دِيْنَ لِمَنْ لَّا عَهْدَ لَهٗ

অর্থ: 'যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালন করে না তার কোনো দীন নেই অর্থাৎ সে প্রকৃত দীনদার নয়।' (শুয়াবুল ইমান)

শিক্ষা

অঙ্গীকার পালন করা নীতি-নৈতিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা নানা সময় নানারূপ ওয়াদা ও অঙ্গীকার করে থাকি। এসব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। কেননা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। পরস্পর মারামারি ও অশান্তি ঘটে। সুতরাং সামাজিক শান্তির জন্য অঙ্গীকার রক্ষা করা আবশ্যক। ইসলামে অঙ্গীকার রক্ষা করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহানবি (স.) নিজে সর্বদা অঙ্গীকার রক্ষা করে চলতেন। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা প্রকৃত দীনদার ব্যক্তির লক্ষণ নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ দীনদার সে সবসময় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলবে। সে কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। অতএব, আমরা কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করব না। বরং জীবনের সকল প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে চেষ্টা করব। তাহলে আমরা প্রকৃত দীনদার হতে পারব।

হাদিস ২

وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِيْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ (بخاری و مسلم)

অর্থ: 'তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা মিথ্যা (মানুষকে) পাপের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপ জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।' (বুখারি ও মুসলিম)

শিক্ষা

মিথ্যা হলো সত্যের বিপরীত। প্রকৃত কথা, কাজ, বিষয়, অবস্থা ইত্যাদি গোপন করাকে মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। কেউ তাকে ভালোবাসে না। মিথ্যাবাদীকে কেউ সাহায্য-সহযোগিতাও করে না। মহানবি (স.) ছিলেন চরম সত্যবাদী। তিনি জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলেননি। তিনি

মানুষকে সত্য কথা বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং মানুষকে মিথ্যা ত্যাগ করতে বলেছেন। কেননা মিথ্যা হলো সকল পাপের মূল। মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়। কোনো পাপ কাজ করে মিথ্যা বললে অনেক সময় তা ধরা যায় না। ফলে মানুষ পুনরায় পাপ করতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা সবকিছু দেখেন ও জানেন। তার নিকট মিথ্যা বলা যায় না। বরং দুনিয়ার সব পাপের তিনি হিসাব রাখেন। হাশরের ময়দানে তিনি এসবের বিচার করবেন।

যেহেতু মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপের শাস্তি হলো জাহান্নাম। সুতরাং আমরা মিথ্যা বলা পরিহার করব। সর্বদা সত্য কথা বলব। তাহলে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে। একদল নৈতিক গুণাবলি বিষয়ক হাদিস দুটি অর্থসহ মুখস্থ বলবে। অন্যদল হাদিস দুটির শিক্ষা সম্পর্কে বলবে। আবার প্রথম দল উক্ত হাদিসের শিক্ষা এবং দ্বিতীয় দল হাদিস দুটি অর্থসহ মুখস্থ বলবে।

পাঠ ১৩

অর্থসহ মুনাজাতমূলক দুটি হাদিস

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন মানবজাতির মহান শিক্ষক। তিনি মানুষকে সবধরনের কল্যাণের পথে পরিচালনা করতেন। মানুষ কীভাবে চললে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করবে তাও তিনি দেখিয়ে গেছেন। উম্মতের কল্যাণের জন্য তিনি বহু মুনাজাত শিক্ষা দিয়েছেন। এসব মুনাজাত হাদিস শরিফে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিম্নে মুনাজাতমূলক দুটি হাদিস উল্লেখ করা হলো। আমরা এ হাদিস দুটি অর্থসহ মুখস্থ করব এবং এগুলোর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট মুনাজাত করব।

হাদিস ১

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَخَطَئِىْ و عَمَدِىْ (طبرانى)

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ, ভুলত্রুটিগুলো এবং ইচ্ছাকৃত অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও।' (তাবারানি)

আমরা কথাবার্তা, চলাফেরায় নানারূপ পাপ কাজ করে ফেলি। ছোটো-বড়ো, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত এসব পাপ আখিরাতে আমাদের শাস্তির কারণ হবে। অতএব, এগুলো থেকে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ক্ষমা চাওয়া দরকার। কেননা মহান আল্লাহই একমাত্র ক্ষমা করার মালিক। সুতরাং আমরা সবসময় এ হাদিসের মাধ্যমে ভুলত্রুটি ও পাপের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইব।

হাদিস ২

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا طَيِّبًا (ابن ماجة)

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী বিদ্যা এবং পবিত্র (হালাল) রিজিক চাই।' (ইবনু মাজাহ)

খাদ্য ও জ্ঞান মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর উপকারী বিদ্যা অর্জন করাও জরুরি। এ উভয় জিনিসের জন্যই মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে। এ হাদিসের মাধ্যমে প্রিয় নবি (স.) আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার নিকট এ দুটি জিনিসের জন্যই প্রার্থনা করার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা এ দোয়াটি মুখস্থ করব ও এর মাধ্যমে মুনাজাত করব।

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা উভয় হাত তুলে নিজেদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবে এবং প্রার্থনায় পাঠের হাদিস ২টি অর্থসহ বলবে।

পাঠ ১৪

নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় হাদিস

জীবনের সকল ক্ষেত্রে মনুষ্যত্ব ও নীতি-আদর্শের শিক্ষাকে ধরে রাখার চেষ্টা ও চেতনাই হলো নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ। আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য এ মূল্যবোধের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ মানুষকে উত্তম চরিত্রবান করে গড়ে তোলে। ফলে মানুষ সমাজে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে। সকলে এ আদর্শ অনুশীলন করলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ না থাকলে সমাজে শান্তি থাকে না। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, প্রতারণা ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মধ্যে দয়া, মায়া, ঐক্য, ভালোবাসা ইত্যাদি সদ্গুণাবলির চর্চা থাকে না। মানুষ পরস্পরকে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করে। ফলে সমাজে নানা অরাজকতা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

মহানবি (স.)-এর হাদিস নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমরা পূর্বপাঠে হাদিসের পরিচয় লাভ করেছি। হাদিসের মাধ্যমে আমরা প্রিয় নবি (স.)-এর বাণী ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি মানুষের সাথে কীরূপ আচরণ করতেন তা জানতে পারি। তাঁর উত্তম চরিত্রের কথা জানতে পারি। তিনি আমাদের জন্য কী দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন তাও আমরা হাদিস পড়ে জানতে পারি।

হাদিস শরিফে প্রিয় নবি (স.) আমাদের নানাবিধ নৈতিক ও মানবিক আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। দয়া, ক্ষমা, সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, পরস্পর সহযোগিতা ইত্যাদি গুণ অনুশীলনের জন্য উৎসাহিত করেছেন। আবার মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, চুরি-ডাকাতি করা, গালিগালাজ করা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ইত্যাদি খারাপ কাজ করতে আমাদের নিষেধ করেছেন। হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহংকার, খোশামোদ-তোষামোদ ইত্যাদিও খারাপ অভ্যাস। এগুলো মানবিক আদর্শের বিপরীত। এগুলো নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে। এগুলো থেকেও বিরত থাকার জন্য মহানবি (স.) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ (أَبُوْ دَاوُدَ)

অর্থ : 'তোমরা হিংসা থেকে বিরত থাকবে। কেননা আগুন যেমন কাঠকে পুড়িয়ে দেয় হিংসাও তেমনি নেক আমলসমূহকে ধ্বংস করে দেয়।' (আবু দাউদ)

সৎগুণাবলির অনুশীলন ও অসৎ গুণাবলি থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আমরা উত্তম চরিত্রবান হতে পারি। এগুলো আমাদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষায়ও সাহায্য করে। এভাবে হাদিসের শিক্ষা আমাদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

হাদিস শরিফে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনচরিত ও উত্তম চরিত্রের আদর্শ বর্ণিত আছে। আমাদের প্রিয় নবি (স.) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (স.)-কে বলেছেন—

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝

অর্থ : "আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা আল-কালাম, আয়াত : ৪)

মহানবি (স.) ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তিনি সবসময় নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অনুসরণ করতেন। তাঁর একটি উপাধি ছিল আল-আমিন। আল-আমিন অর্থ বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত, সত্যবাদী। তিনি সবসময় সত্য কথা বলতেন। কথা ও কাজে সততা অবলম্বন করতেন। কেউ কোনো কিছু আমানত বা গচ্ছিত রাখলে তিনি তা মালিকের নিকট যথাযথভাবে ফেরত দিতেন। তিনি কখনো মিথ্যা বলতেন না, ওয়াদা ভঙ্গ করতেন না, বিশ্বাসঘাতকতা করতেন না। ফলে তাঁর শত্রুরাও তাঁকে আল-আমিন বা বিশ্বাসী নামে ডাকত।

এভাবে দেখা যায়, সবধরনের সৎগুণ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল, দয়াবান, অতিথিপরায়ণ, মিষ্টভাষী। তিনি অন্যায় ও অশ্লীল কাজ কখনো করতেন না। অশালীন চলাফেরা ও কথাবার্তা তাঁর থেকে কখনো প্রকাশিত হয়নি। সারাজীবন তিনি মানুষকে উত্তম চরিত্র সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসুলের (স.) এ আদর্শ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রিয় নবি (স.)-এর চরিত্র অনুসরণ করলে কখনোই নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ লঙ্ঘিত হবে না। বরং এর দ্বারা আমরা প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারব। আমাদের মধ্য থেকে দুর্নীতি ও পশুত্ব দূরীভূত হবে। রাসুলের (স.) জীবনাদর্শ হাদিস শরিফে সুন্দরভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলো মানুষের জন্য দিকনির্দেশনা স্বরূপ। আমরা হাদিস পড়ে এগুলো জানব এবং সে অনুযায়ী আমল করব।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১। মাখরাজ হলো .... স্থান।

২। জাওফ হলো .... ভিতরের খালি জায়গা।

৩। সূরা আল-ফালাক্ব পবিত্র কুরআনের .... তম সূরা।

৪। সূরা আল-হুমাযাকে .... অংশে ভাগ করা যায়।

৫। হাদিসের অপর নাম হলো .... ।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফে	ফাতিহাতুল কিতাব বলা হয়।
২। তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন	সহযোগিতা করে না।
৩। সূরা আল-ফাতিহাকে	দশটি নেকি পাওয়া যায়।
৪। মিথ্যাবাদীকে কেউ সাহায্য	সমাজে অশান্তির সৃষ্টি হয়।
৫। অবিশ্বাস ও সন্দেহের কারণে	পড়া আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। আল-কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। মাখরাজ বলতে কী বোঝায়?

৩। হাদিসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। বিশুদ্ধ কুরআন পাঠে তাজবিদের ভূমিকা বর্ণনা কর।

২। সূরা আল-ফাতিহার ব্যাখ্যা লেখ।

৩। হাদিসের আলোকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দাও।

২০১৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মহানবি (স.) কত বছর বয়সে নবুয়তপ্রাপ্ত হন?

ক. পঁচিশ খ. ত্রিশ
গ. চল্লিশ ঘ. পঞ্চাশ

২। আল্লাহ তায়ালা সর্বমোট কতটি আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন?

ক. ৪ খ. ২৯
গ. ১০০ ঘ. ১০৪

৩। নিম্নের কোন সূরাটি আল-কুরআনের সর্বশেষ সূরা?

ক. সূরা আল-ফালাক্ব খ. সূরা আন-নাস
গ. সূরা আল-হুমাযাহ ঘ. সূরা ইয়াসিন

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাবিহা ও মালিহা দুই বান্ধবী। সাবিহা সবসময় নামায পড়লেও মালিহা মাঝে মাঝে নামায পড়ে না। তখন সাবিহা মালিহাকে বুঝিয়ে বলে যে, শয়তান সবসময় আমাদের পিছু লেগে থাকে। আমাদেরকে ভুলপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। দীন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এসব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবসময় আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে এবং আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলতে হবে।

৪। সাবিহা মালিহাকে যে কথাগুলো বলেছে তা নিম্নের কোন সূরায় বর্ণিত রয়েছে?

ক. সূরা আল-ফাতিহা খ. সূরা আল-ইখলাস
গ. সূরা আল-ফালাক্ব ঘ. সূরা আন-নাস

৫। উদ্দীপকে উল্লিখিত সূরাটির মর্মকথা হলো—

i. মানুষ যেন আল্লাহর ইবাদত না করে শয়তান সে কুমন্ত্রণা দেয়

ii. তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা

iii. শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আব্দুর রহিম সুললিত কণ্ঠের অধিকারী হলেও তাড়াতাড়ি কুরআন তিলাওয়াত করেন। ফলে মাঝে মাঝে কিছু ভুল হয়ে যায়। অপরপক্ষে তাঁর সহপাঠী আব্দুল করিমের কণ্ঠস্বর সুমধুর নয়। কিন্তু তিনি দেখে ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

ক. আল-কুরআনের অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ প্রথম সূরা কোনটি?
খ. "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর" আয়াতটি ব্যাখ্যা কর।
গ. আব্দুর রহিমের কুরআন তিলাওয়াতে শরিয়তের কোন বিধানটি পালন হয়নি? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. আব্দুল করিমের কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। সাদিয়া ও নাদিয়া একই অফিসে চাকরি করেন। তাঁদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উভয়কে ৬ মাসের জন্য একটি কাজের তালিকা দেন। তাঁরা উভয়ে উক্ত কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করার প্রতিজ্ঞা করেন। সাদিয়া নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করলে কর্তৃপক্ষ খুশি হয়ে তাঁকে পদোন্নতি প্রদান করেন। কিন্তু নাদিয়া যথাসময়ে কাজ শেষ করতে না পারায় তিরস্কারের শিকার হন। ফলে নাদিয়া সাদিয়াকে হিংসা করতে শুরু করল। তখন সাদিয়া বলেন, 'পরহিংসা নরক বাস, যুগে যুগে সর্বনাশ।'

ক. হাদিস শব্দের অর্থ কী?
খ. মাখরাজ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
গ. সাদিয়ার কর্মে কী প্রকাশ পেয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. নাদিয়ার কর্মকাণ্ডের পরিণাম সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক (ٱلْأَخْلَاقُ)

মহান আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে সৃষ্টির সেরা হিসেবে পাঠিয়েছেন। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা বজায় রাখতে হলে প্রয়োজন সুন্দর আচার-আচরণ। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে যেসব আচার-ব্যবহার, চালচলন এবং স্বভাবের প্রকাশ ঘটে সেসবের সমষ্টিই আখলাক। এটি শুধু মানুষের সাথেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং জীবজন্তু, পশুপাখি, গাছপালা ও পরিবেশের সাথেও সুন্দর আচরণ প্রয়োজন।

মানুষ সামাজিক জীব। পরিবার এবং সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। কখনো আখলাক (আচরণ) প্রশংসনীয় হয় আবার কখনো নিন্দনীয় হয়। প্রশংসনীয় আচরণকে আখলাকে হামিদাহ্ বা সচ্চরিত্র বলে। আর নিন্দনীয় আচরণকে আখলাকে যামিমাহ্ বলে।

আখলাকে হামিদাহ্ বা প্রশংসনীয় আচরণগুলো হলো সত্যবাদিতা, পিতামাতার প্রতি উত্তম ব্যবহার, শিক্ষকদের সম্মান করা, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, সহপাঠীদের সাথে সদাচরণ, বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটোদের প্রতি স্নেহ ইত্যাদি।

আখলাকে যামিমাহ্ বা নিন্দনীয় আচরণগুলো হলো মিথ্যা কথা বলা, পরনিন্দা করা, আমানতের খিয়ানত করা, গালি দেওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের আখলাকে হামিদাহ্ অর্জন ও আখলাকে যামিমাহ্ বর্জন করা উচিত। আমরা আখলাকে হামিদাহ্ অর্জন করব এবং আখলাকে যামিমাহ্ বর্জন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- আখলাকের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- সদাচরণের ধারণা ও কতিপয় সদাচরণের গুরুত্ব ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কতিপয় অসদাচরণের ধারণা, পরিণতি এবং এগুলো পরিহারের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধূমপান ও মাদকাসক্তির ধারণা ও কুফল বর্ণনা করতে পারব।
- বাস্তব জীবনে সদাচরণে আগ্রহী হবো, অসদাচরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে উদ্বুদ্ধ হবো এবং নিকটতম ব্যক্তিদেরও বিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করব।
- ধূমপান ও মাদকাসক্তিজনিত সামাজিক ক্ষতি এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে আগ্রহী হবো।

পাঠ ১
আখলাকে হামিদাহ্ (اَلْاَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ)

আখলাকে হামিদাহ্ বা প্রশংসনীয় আচরণ মানুষের জীবনে খুবই প্রয়োজন। সুন্দর আচরণের মাধ্যমে মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব তৈরি হয়। সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ ভাব বজায় থাকে। পারস্পরিক লেনদেন সহজতর হয়। জীবন হয়ে ওঠে মধুময়। তাই সচ্চরিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, 'কিয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে মুমিনের উত্তম চরিত্র।' (তিরমিযি)

মহানবি (স.) আরও বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় যার চরিত্র উত্তম।' (বুখারি ও মুসলিম)

মহান আল্লাহ্ মানুষকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। এগুলোর মধ্যে সচ্চরিত্র একটি উত্তম নিয়ামত। সচ্চরিত্র শিক্ষার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। পরিপূর্ণ সচ্চরিত্রের প্রতীক ছিলেন তিনি। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : "অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ২১)

মহানবি (স.)-এর চরিত্রের মধ্যে সদাচরণের গুণগুলো পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসুল (স.) ঘোষণা করেন—

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ

অর্থ : 'আমি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছি।' (মুসনাদে আহমাদ)

আমাদের জন্য মহানবি (স.)-এর সমগ্র জীবনই উত্তম অনুকরণীয় আদর্শ। আমরা মহানবি (স.)-এর জীবন অনুসরণ করে নিজেদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ভালো অভ্যাস ও মন্দ অভ্যাসের তালিকা বা চার্ট তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

২০২৩

পাঠ ২
সত্যবাদিতা (اَلصِّدْقُ)

সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ হলো সিদক (صِدْقٌ)। এর অর্থ হলো সততা, সত্যবাদিতা, সত্য কথা বলা, সত্য সাক্ষ্য দেওয়া ইত্যাদি। বাস্তব বা প্রকৃত ঘটনা যথাযথ প্রকাশ করাকে সত্যবাদিতা বলে। যে ব্যক্তির মধ্যে এ মহৎগুণ আছে তাকে বলে সাদিক (صَادِقٌ) বা সত্যবাদী। যে সত্য কথা বলে তাকে সবাই ভালোবাসে ও সম্মান করে। সত্যবাদী দুনিয়াতে যেমন সম্মানের অধিকারী হন তেমনিভাবে আখিরাতেও পরম সুখ লাভ করবেন। আমাদের প্রিয় নবি (স.) বাল্যকাল থেকে সকলের নিকট সত্যবাদী এবং বিশ্বাসী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাই সবাই তাঁকে আল-আমিন বলে ডাকত এবং সম্মান করত। তিনি জীবনে মিথ্যা কথা বলেননি। প্রাণের শত্রুও তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে পারেনি। যে সত্য কথা বলে না তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সত্যবাদিতা সম্পর্কে বলেন—

فَاِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ وَاِنَّ الْكِذْبَ رِيْبَةٌ

অর্থ : 'সত্য হলো প্রশান্তি এবং মিথ্যা হলো সংশয়।' (তিরমিযি)

সত্যবাদিতার উপকারিতা সম্পর্কে নবি করিম (স.) আরও বলেন, 'তোমাদের অবশ্যই সত্যবাদী হওয়া উচিত। কেননা সত্যবাদিতা মানুষকে পুণ্যের পথে পরিচালিত করে, আর পুণ্য বেহেশতের পথে পরিচালিত করে।' পবিত্র কুরআনুল করিমে সত্যবাদীকে জান্নাত (বেহেশত) দানের কথা বলা হয়েছে—

هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ

অর্থ : "এই তো সেদিন–যেদিন সত্যবাদীগণ তাদের সততার জন্য উপকৃত হবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ১১৯)

আমাদের বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.)-এর জীবনে সত্যবাদিতা সম্পর্কে একটি বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায়। তখন তিনি অল্পবয়স্ক বালক। শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি বাগদাদ রওনা হলেন। গমনের সময় মা তাঁকে সর্বদা সত্য কথা বলার আদেশ করেন। পথিমধ্যে একদল ডাকাত তাদের কাফেলার উপর হামলা করে। ডাকাত দল একে একে কাফেলার সকলকে তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় বালক আব্দুল কাদিরকে জিজ্ঞাসা করল যে হে বালক, 'তোমার কাছে কিছু আছে কি?' তিনি নির্ভয়ে উত্তর দিলেন, 'চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা আছে।' তাঁর কথা যাচাইয়ের জন্য ডাকাত সর্দার ধমক দিয়ে বলল, 'কোথায় স্বর্ণমুদ্রা? আমাদের তা দেখাও।' তিনি তাঁর জামার আস্তিনে সেলাই করা অবস্থায় ডাকাতদের তা বের করে দেখালেন। ডাকাতরা তাঁর সততা দেখে অবাক হয়ে বলল, 'এরূপ লুকানো স্বর্ণমুদ্রা আমরা খুঁজে পেতাম না, তুমি কেন বললে?' তিনি বললেন, 'আপনারা জিজ্ঞাসা করায় আমি সত্য কথা বলে দিয়েছি। কারণ আমার মা আমাকে সর্বদা সত্য কথা বলতে বলেছেন।'

ডাকাতরা বালক আব্দুল কাদিরের সততায় মুগ্ধ হয়ে নিজেদের পাপকর্ম সম্পর্কে অনুশোচনা করল। তারা ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে সৎ পথে চলার প্রতিজ্ঞা করল। সত্যবাদিতা এভাবেই মানুষকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখায়।

আমাদের প্রতিজ্ঞা : সদা সত্য কথা বলব।

[শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এরূপ আরও ছোটো ঘটনা বলে শুনাবে এবং তাদের এরূপ আরও ছোটো ছোটো ঘটনা বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।]

কাজ : যদি বালক আব্দুল কাদির সত্য গোপন করত তাহলে কী ক্ষতি হতে পারত। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে খাতায় লিখে দেখাবে।

পাঠ ৩
পিতামাতার প্রতি কর্তব্য

সুন্দর পৃথিবীতে পিতামাতা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। আমাদের জীবনে তাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি। জন্মের সময় আমরা ছিলাম অসহায়। আমরা নিজেদের প্রয়োজনের কথাও বলতে পারতাম না। পিতামাতা বুক ভরা স্নেহ-মমতা দিয়ে লালনপালন করে আমাদের বড়ো করে তোলেন। অসুখে-বিসুখে দিনরাত কষ্ট করে সেবাযত্ন করেন। সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পিতামাতা আমাদের জন্য আল্লাহর সেরা দান। তাঁরা সর্বদা আমাদের কল্যাণ কামনা করেন। পিতামাতার চেয়ে আপনজন পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সুতরাং এরূপ কল্যাণকামী পিতামাতার প্রতি আমাদেরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

কর্তব্য

পিতামাতার আদেশ-নিষেধ পালন সন্তানের জন্য ওয়াজিব (কর্তব্য)। সেই সাথে পিতামাতার সেবা-যত্ন করাও আমাদের কর্তব্য। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন—

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ

অর্থ: "তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৩)

পিতামাতা বৃদ্ধ হলে সন্তান তাঁদেরকে অধিকতর সেবাযত্ন করবে। তাঁদেরকে ধমক দেবে না বা মনে কষ্ট পায় এরূপ কোনো কথা বা কাজ করবে না। তাঁদের সাথে উত্তম ও সম্মানজনক ভাষায় কথা বলবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন—

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ○

অর্থ: "যদি পিতামাতার একজন অথবা উভয়ে তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাঁদের প্রতি তুমি বিরক্তিসূচক শব্দ 'উহ্' উচ্চারণ করো না এবং তাঁদেরকে ধমক দিও না। তাঁদের সাথে সম্মানজনক ভাষায় কথা বলো।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৩)

তাঁদের উদ্দেশ্যে সর্বদা আল্লাহর নিকট আমাদের এই দোয়া করা উচিত—

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ○

অর্থ : "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার পিতামাতার প্রতি তেমনি সদয় হও! যেমনিভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবে (আদরযত্নে) লালনপালন করেছেন।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৪)

পিতামাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করা সন্তানের উপর কর্তব্য। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন—

قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ

অর্থ : "বলুন, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য।"
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২১৫)

পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য।
এ সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর বাণী :

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ

অর্থ : 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।' (আত-তারগিব)

মহানবি (স.) আরও বলেছেন, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।' (তিরমিযি)

পিতামাতার প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করলে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করা যায়।

পিতামাতা আমাদের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। আমরা তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করব। তাঁদের অবাধ্য হবো না। তাঁদের জন্য দোয়া করব।

কাজ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পিতামাতার প্রতি কী কী কর্তব্য রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৪

আত্মীয়স্বজনের প্রতি কর্তব্য

আত্মীয় শব্দটি এসেছে আত্মা থেকে। আত্মার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে আত্মীয় বলে। যাদের সাথে জীবনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তাদের আমরা আত্মীয় বলি। ইসলামের দৃষ্টিতে পিতামাতা ও সন্তানের পর অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে যারা অগ্রগণ্য তারাই আত্মীয়। যেমন : ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-চাচি, মামা-মামি, শ্বশুর-শাশুড়ি এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আপনজন।

ইসলামি সমাজে পিতামাতার ন্যায় আত্মীয়স্বজনের প্রতিও আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। আত্মীয়দের মধ্যে যারা বড়ো তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো এবং যারা ছোটো তাদের অবশ্যই আদর ও স্নেহ করতে হবে। আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। আত্মীয়দের মধ্যে গরিব-ধনী নির্বিশেষে সকলের সাথে সৌজন্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। গরিব ও অভাবগ্রস্ত আত্মীয়দের প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী :

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى

অর্থ : "আল্লাহর ভালোবাসা লাভের জন্য নিকট আত্মীয়দের দান করে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৭৭)

আত্মীয়রা রোগাক্রান্ত হলে তাদের সেবাযত্ন করতে হবে। বিপদে-আপদে খোঁজখবর নিতে হবে। আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন—

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى

অর্থ : "পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং নিকট আত্মীয়দের সাথেও উত্তম আচরণ প্রদর্শন করবে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩৬)

তিনি আরও বলেন—

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى

অর্থ : "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ন্যায়বিচার কায়েম করতে, পরস্পরের প্রতি ইহ্সান বা উপকার করতে ও আত্মীয়স্বজনের অধিকার আদায় করতে নির্দেশ দিচ্ছেন।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯০)

আত্মীয়দের কোনোরূপ কষ্ট দেওয়া যাবে না। আত্মীয়দের সাথে কোনোরূপ সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। এ মর্মে রাসুল (স.) বলেছেন—

لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ

অর্থ : 'যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী লোক থাকে সে সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না।' (বায়হাকি)

কোনো অন্যায় বা অসৎ কাজে আত্মীয়কে সাহায্য করা যাবে না। বরং অন্যায় কাজ থেকে তাকে বিরত রাখাই দায়িত্ব। আত্মীয়দের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করলে পৃথিবীতে লাভবান হওয়া যায়। নবি করিম (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কামনা করে যে তার জীবিকা ও আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়দের সাথে সুন্দর আচরণ করে।' (বুখারি ও মুসলিম)

আত্মীয়স্বজনের সাথে আমরা সকলে ভালো ব্যবহার করব। তাদের প্রাপ্য আদায় করব। তাদের দুঃখ-কষ্টে সাহায্য সহযোগিতা করব। তাদের সকল বৈধ কাজে সহযোগিতা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আত্মীয়দের সাথে কীভাবে সদাচরণ করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৫

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য

মানুষ সামাজিক জীব। আমরা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করি। আমাদের আশপাশে আরও অনেক লোক বসবাস করে। আমাদের চারপাশে আরও যারা বসবাস করে তারা সকলেই আমাদের প্রতিবেশী। আমাদের নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, 'সামনে পিছনে ডানে বামে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী।'

স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে পাশাপাশি অবস্থানকারী কিংবা সাময়িকভাবে আশপাশে অবস্থানকারীকে প্রতিবেশী বলা হয়। এমনকি চলার পথের সহযাত্রীদেরও প্রতিবেশী বলা যায়।

কর্তব্য

আমরা মুসলমান। আমাদের চারপাশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান যারা বসবাস করে তারা সবাই আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করা আমাদের কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে রাসুল (স.)-এর বাণী :

خَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ

অর্থ : 'আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশী সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম।' (তিরমিযি)

প্রতিবেশীকে বিপদে-আপদে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। মহানবি (স.) এ সম্পর্কে আরও বলেন,

'সেই ব্যক্তি আমার উপর প্রকৃত ইমান আনেনি যে আরামে রাত কাটায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত।' (দারিমি)

অসুখে-বিসুখে প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন। প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা উচিত নয়, তাদের মঙ্গল কামনা করা, কোনো প্রকার কষ্ট না দেওয়া এবং অন্যায়-অত্যাচার না করা আমাদের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব। এ বিষয়ে রাসুল (স.) বলেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

অর্থ : 'সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ থেকে নিরাপদ নয়।' (মুসলিম)

প্রতিবেশীদের একজনের হক অন্যজনের কাছে আমানতস্বরূপ। এ আমানতকে অবশ্যই হেফাজত করতে হবে। প্রতিবেশী যে কেউ কিংবা যেমনই হোক, জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে সকলকে সমান মর্যাদা দিতে হবে।

প্রতিবেশীকে প্রথমে সালাম দেওয়া এবং খানা-পিনায় শরিক করা প্রতিবেশীর কর্তব্যের শামিল। তাদের মাঝে উপহার উপঢৌকন বিনিময় করাও প্রতিবেশীর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবেশীকে কোনোরূপ ঘৃণা করা যাবে না এবং হীন ও নগণ্য মনে করা যাবে না। প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

'প্রতিবেশীর হক হলো, সে যদি রোগাক্রান্ত হয় তাহলে তুমি তার সেবা করবে। সে মরে গেলে তার লাশের সঙ্গে কবরস্থান পর্যন্ত যাবে, কাফন দাফনে অংশগ্রহণ করবে। সে যদি অর্থ অভাবে পড়ে, তাহলে তুমি তাকে ঋণ দেবে, সে যদি পরনের জন্য কাপড় সংগ্রহ করতে না পারে, তাহলে তুমি তাকে কাপড় সংগ্রহ করে দেবে। আর যদি কোনো কল্যাণ হয় তুমি তাকে মুবারকবাদ জানাবে। সে যদি কোনো বিপদে পতিত হয় তবে তুমি তার দুঃখের ভাগ নেবে, সহানুভূতি জানাবে। তোমার ঘর তার ঘর থেকে উঁচু বানিয়ে তাকে মুক্ত বায়ু থেকে বঞ্চিত করবে না। তোমার রান্নার পাত্রের বাতাস দিয়েও তাকে কষ্ট দেবে না। যদি তেমন অবস্থা হয়ই তাহলে তাকে এক চামচ খাবার পাঠিয়ে দেবে।' (তাবারানি)

প্রতিবেশী অভাবগ্রস্ত, দরিদ্র বা শ্রমজীবী হলেও তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। তাদের পেশাকে সম্মান করতে হবে। সুখে-দুঃখে পাশে থাকতে হবে, সম্মানের সাথে তাদের সম্বোধন করতে হবে।

আমরা প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে থাকব। সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে তাদের পাশে দাঁড়াব। তাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করব না।

কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার সুফল সম্পর্কে দলীয়ভাবে পাঁচটি করে বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৬

বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটোদের প্রতি স্নেহ

মানব চরিত্রের একটি প্রশংসনীয় আচরণ হলো বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটোদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা। একজন আদর্শ মানুষ বড়োদের শ্রদ্ধা ও ছোটোদের স্নেহ করেন। প্রিয় নবি (স.) বড়োদের সম্মান করতেন এবং ছোটোদের আদর করতেন। তিনি সর্বদা ছোটোদের আবদার রক্ষা করার চেষ্টা করতেন।

বড়োদের শ্রদ্ধা ও ছোটোদের স্নেহ করার গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে ছোটোরা বড়োদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখে এবং বড়রা ছোটদের স্নেহ করেন ও ভালোবাসেন। ফলে সমাজে এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মহানবি (স.) বলেন—

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا

অর্থ : 'সে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয় যে ব্যক্তি ছোটোদের স্নেহ করে না এবং বড়োদের শ্রদ্ধা-সম্মান করে না।' (তিরমিযি)

বড়োদের সালাম প্রদান করা, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, সৌজন্য বজায় রেখে কথাবার্তা বলা, প্রয়োজনে বড়োদের কাজকর্মে সাহায্য সহযোগিতা করা, তাদের আদেশ উপদেশ মেনে চলা এবং বসা থাকলে উঠে তাদের বসার ব্যবস্থা করা ছোটোদেরও মানবিক কর্তব্য।

বড়োদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পরকালে বিশেষ সাওয়াব অর্জিত হবে এবং জান্নাত লাভ সহজ হবে। ছোটোদের আদর সোহাগ করা, তাদের ভালো কাজে উৎসাহ প্রদান করা বড়দের কর্তব্য। এতে ছোটোদের মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়।

প্রিয় নবি (স.) বলেছেন—

'কোনো বৃদ্ধকে যদি কোনো যুবক বার্ধক্যের কারণে শ্রদ্ধা করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা ঐ যুবকের জন্য বৃদ্ধ অবস্থায় এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যে তাকে শ্রদ্ধা করবে।' (তিরমিযি)

কাজ : শিক্ষার্থীরা চার-পাঁচজন করে দলে বিভক্ত হয়ে বড়োদের প্রতি ছোটোদের করণীয়গুলো পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৭

সহপাঠীদের সাথে সদ্ব্যবহার

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের বিভিন্ন লোকের সাথে মিলেমিশে কাজকর্ম করতে হয়। আমরা যে স্কুল বা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি, সেখানে আমাদের সাথে আরও অনেকে পড়াশোনা করে। বিদ্যালয়ে আমরা যাদের সাথে একই শ্রেণিতে লেখাপড়া করি তারা সকলেই আমাদের সহপাঠী। সহপাঠীদের সাথে আমাদের আন্তরিক ও মধুর সম্পর্ক রয়েছে। সহপাঠীরা আমাদের ভাইবোনের মতো। স্কুলে আমরা একে অপরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ রাখি। স্কুলে আমাদের সহপাঠীদের কেউ অসুস্থ হলে সেবা করা আমাদের কর্তব্য। প্রয়োজনে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, যেমন: বই, খাতা, কলম, পেনসিল কারো না থাকলে তাকে দিয়ে সাহায্য করা উচিত। আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে কারো মন খারাপ হলে, বিষণ্ন বা চিন্তিত হলে তার বিষণ্নতার ভাব দূর করার চেষ্টা করতে হবে। সহপাঠীদের সাথে উত্তম আচরণ করা উচিত। তাদেরকে উত্তম শব্দে সম্বোধন করতে হবে।

কাউকে খাটো করে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে, একে অপরকে মর্যাদা দিতে হবে। সহপাঠীদের সাথে কটুবাক্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কারো মনে কষ্ট পেতে পারে এমন কোনো আচরণ থেকে বিরত থাকব। কেউ কোনো বিপদে পতিত হলে বিপদ দূর করার চেষ্টা করব। কারো ব্যথায় সান্ত্বনা দেবো। কাউকে উপনামে ডাকব না। কারো পিছনে লাগব না। দোষ-ত্রুটি ধরে লজ্জা দেবো না।

সহপাঠীদের সুখে আমরা সুখী হই আবার কারো কোনো দুঃসংবাদ শুনলে আমরা ব্যথিত হই। ধৈর্য-ধারণের পরামর্শ প্রদান করি। কখনো কোনো সুখবর পেলে আমরা তার আনন্দে শরিক হই।

সহপাঠীদের সাথে সদ্ব্যবহার করলে বা সম্পর্ক থাকলে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ভালো থাকে, বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর হয়। সুশিক্ষার জন্য এটা খুব প্রয়োজন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে সহপাঠীদের প্রতি কর্তব্যের একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৮
আখলাকে যামিমাহ্ (اَلْأَخْلَاقُ الذَّمِيْمَةُ)

আখলাকে যামিমাহ্ অর্থ হলো অসদাচার বা নিন্দনীয় আচরণ। এমন কতগুলো নৈতিক অবক্ষয়মূলক আচরণ যা মানুষকে হীন, নীচ, ইতর শ্রেণিভুক্ত ও নিন্দনীয় করে। মিথ্যাচার, গিবত, পরনিন্দা, গালি দেওয়া ইত্যাদি আখলাকে যামিমাহ্ বা নিন্দনীয় আচরণ। এগুলো বর্জন করতে হবে। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে এ ধরনের আচরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহর বাণী :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

অর্থ : "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করো না এবং তোমরা জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৪২)

এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তির সম্মান সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে যার অনিষ্টের ভয়ে লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করে।' (বুখারি ও মুসলিম)

আমাদের প্রিয় নবি যাবতীয় নিন্দনীয় আচরণ থেকে পবিত্র ছিলেন, তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। কাউকে তিনি কখনো গালি দেননি। ওয়াদা ভঙ্গ করেননি, কারো সাথে প্রতারণা করেননি।

আমরা রাসুল (স.)-এর এ সকল আদর্শ অনুসরণ করব।

আমাদের প্রতিজ্ঞা—

- আমরা কখনো মিথ্যা কথা বলব না।
- ওয়াদা ভঙ্গ করব না।
- প্রতারণা করব না।
- কারো গিবত করব না।

পাঠ ৯

মিথ্যাচার (اَلْكِذْبُ)

মিথ্যা সকল পাপ কাজের জননী। প্রকৃত অবস্থা বা ঘটনাকে বিকৃত করে পরিবেশন করাকে মিথ্যাচার বলে। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে বা প্রকৃত ঘটনার বিকৃতি ঘটায় তাকে মিথ্যাবাদী বলে।

মিথ্যা একটি জঘন্যতম অপরাধ। এটি সকল পাপ কাজের মূল। মিথ্যা থেকে পাপ কাজের সূচনা হয়। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অন্যের মাল অপহরণ এ সকল অনৈতিক ও সমাজবিরোধী কর্মের মূলে রয়েছে মিথ্যাচার। যে সমাজে মিথ্যাচার বৃদ্ধি পায় সে সমাজ ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়।

মিথ্যাচার একটি নিন্দনীয় আচরণ। মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না। কেউ বিশ্বাস করে না। বিপদের সময় তাকে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। সকলে তাকে ঘৃণা করে। তার কথাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। পরিণামে দুনিয়াতে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। মহান আল্লাহ তায়ালা তার উপর খুব অসন্তুষ্ট হন। আর তাই পরকালে তার স্থান হবে জাহান্নাম।

মহানবি (স.) এ বিষয়ে বলেন—

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ

অর্থ : 'আর তোমরা অবশ্যই মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে। কেননা মিথ্যা পাপ কাজের দিকে ধাবিত করে। আর পাপ কাজ জাহান্নামের পথে ধাবিত করে।' (মুসলিম)

মিথ্যা বর্জন করা কর্তব্য। মিথ্যা পরিত্যাগ করলে সকল পাপ থেকে বাঁচা যায়। মিথ্যাবাদীর কাছ থেকে রহমতের ফেরেশতারাও দূরে সরে যান। মহানবি (স.) বলেছেন, 'বান্দা যখন মিথ্যা কথা বলে, ফেরেশতারা তখন এর দুর্গন্ধের কারণে তার থেকে দূরে চলে যান।' (তিরমিযি)

আমাদের প্রিয় নবি (স.) কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। তিনি স্বার্থের পরিপন্থী হলেও কখনো মিথ্যা বা প্রতারণার আশ্রয় নিতেন না।

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সত্যের উপকারিতা এবং মিথ্যার অপকারিতার উপর একটি পোস্টার লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১০

গিবত বা পরনিন্দা (اَلْغِيْبَةُ)

গিবত একটি সামাজিক অনাচার। কারো অগোচরে তার দোষ-ত্রুটি অন্যের কাছে প্রকাশকে গিবত বলে। একে পরনিন্দাও বলা যায়। গিবত একটি ঘৃণিত ও জঘন্য কাজ। এটি কবিরা গুনাহ। এ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। রাসুল (স.) বলেন, 'গিবত কী তা কি তোমরা জানো?' লোকেরা উত্তরে বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।' রাসুল (স.) বললেন, 'গিবত হলো তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে।' জিজ্ঞাসা করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, এটাও কি গিবত হবে? রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, 'তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই গিবত হবে। আর তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তা হবে 'বুহতান' বা অপবাদ।' (মুসলিম)

গিবত একটি নিন্দনীয় কাজ। গিবতের মাধ্যমে মানুষে মানুষে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে সমাজ জীবনে ঝগড়াফ্যাসাদসহ নানা অশান্তি সৃষ্টি হয়।

পবিত্র কুরআনুল করিমে গিবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী :

"তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে, নিশ্চয়ই তা তোমরা অপছন্দ করবে।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত : ১২)

গিবত করার মতো গিবত শোনাও পাপের কাজ। কেউ গিবত করলে তাকে গিবত থেকে বিরত রাখা কর্তব্য। তাহলে গিবতচর্চা সমাজ থেকে ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাবে বা দূরীভূত হবে।

সর্বাবস্থায়ই গিবত বা পরনিন্দা থেকে মুক্ত হতে হবে। কারণ কোনো অবস্থায়ই গিবত জায়েজ বা বৈধ নয়। কেউ যদি গিবত করে তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যার গিবত করা হয়েছে তার থেকে অবশ্যই মাফ চেয়ে নিতে হবে। আর যদি সে মারা যায়, তার থেকে ক্ষমা চাওয়া সম্ভব না হয়, তবে আল্লাহর নিকট তার গুনাহ মাফের দোয়া করতে হবে। রাসুল (স.) বলেন, 'নিঃসন্দেহে গিবতের একটি ক্ষতিপূরণ হলো, তুমি যার গিবত বা কুৎসা রটনা করেছ তার জন্য এভাবে দোয়া করবে: হে আল্লাহ! তুমি আমার ও তার গুনাহ মাফ করে দাও।'

এক মুসলমানের সম্পদ, জীবন ও সম্মান অপর মুসলমানের কাছে পবিত্র আমানত। গিবত অপর মুসলমান ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করে বিধায় এটি ইসলামে হারাম।

গিবত ব্যভিচার থেকেও অধিকতর অপরাধ। রাসুল (স.) বলেছেন, 'গিবত বা পরনিন্দা ব্যভিচার অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ।' (আল-মুজামুল আওসাত)

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে কী কী কাজ গিবত বা পরনিন্দার মধ্যে পড়ে, তার একটি চার্ট তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১১

গালি দেওয়া (اَلسَّبُّ)

কাউকে মন্দ নামে ডাকা, মন্দ কথা বলা, তিরস্কার করা, অশালীন বা অশ্লীল কথা বলা হলো গালি দেওয়া। কারো সম্পর্কে এরূপ বাক্য ব্যবহার করা যাতে তার হীনতা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় তাও গালিস্বরূপ। কাউকে গালি দেওয়া বা মন্দ নামে ডাকা নিন্দনীয় কাজ। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ইমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ।" (সুরা আল-হুজুরাত, আয়াত : ১১)

মানুষ সভ্যজাতি, তারা কাউকে গালি দেবে না। সমাজে একত্রে বসবাস করতে হলে পরস্পরের সাথে মতের অমিল থাকতে পারে। একে অপরের সাথে ভুল বোঝাবুঝিও হতে পারে। একের সাথে অন্যের কথা কাটাকাটি হতে পারে। কিন্তু তাতে একে অন্যকে অশালীন বা অশ্লীল কথা বলে গালি দেওয়া উচিত নয়। অশালীন কথা বলা নিতান্তই খারাপ কাজ। যে গালি দেয়, অশালীন কথা বলে, সে সমাজে ঘৃণিত। তাকে মানুষ পছন্দ করে না। সমাজে তার কোনো সমাদর থাকে না। তার সাথে কেউ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে না। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) গালি দিতে বা গালিগালাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন—

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

অর্থ : 'মুসলমানদের গালি দেওয়া পাপ এবং হত্যা করা কুফরি।' (বুখারি ও মুসলিম)

কেউ যদি গালি দেয় তবে তার উত্তরে গালি দেওয়া উচিত নয়।

একবার মহানবির কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল আমাকে আমার সম্প্রদায়ের এমন এক ব্যক্তি গালি দেয় যে আমার থেকে নীচু। এর প্রতিশোধ নিতে আমার কোনো বাধা আছে কি?' রাসুল (স.) তাকে বললেন, 'পরস্পর গালমন্দকারী উভয়েই শয়তান। তারা পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলে এবং একে অপরের দোষারোপ করে।' (বুখারি ও মুসলিম)

গালি সম্পর্কে আরও বলেছেন, পিতামাতাকে গালি দেওয়া মহাপাপ। সাহাবিগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল এমন কোনো নরাধম আছে যে আপন পিতামাতাকে গালি দেয়?' তিনি বললেন, 'যে অপরের পিতামাতাকে গালি দেয় এবং অপরও তার পিতামাতাকে গালি দেয়।' (বুখারি ও মুসলিম)

হাদিস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অন্যের পিতামাতাকে গালি দেওয়া মানে নিজের পিতামাতাকে গালি দেওয়া। সমাজ গালিমুক্ত করতে গালির উত্তরে গালি দেবো না, এতে গালমন্দকারী লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। গালমন্দ ভালো কাজ নয়, গালমন্দের ন্যায় অশালীন কাজ হতে আমরা বিরত থাকব।

কাজ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে গালির ক্ষতিকারক বা কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১২
ধূমপান ও মাদকাসক্তি

এই অপরূপ সুন্দর পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টির সেরা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তবে এর মধ্যে কিছু কিছু বস্তু মানুষের খাদ্য হিসেবে বৈধ বা হালাল করেছেন। আর যা মানুষের খাদ্য হিসেবে কল্যাণকর নয় তা অবৈধ ও হারাম করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী, "তোমরা উত্তম ও পবিত্র জিনিস খাও, তোমাদেরকে যা আমি রিজিক হিসেবে দান করেছি।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৭২)

খাদ্য গ্রহণে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও মানুষ অসৎ সঙ্গ ও কুপ্ররোচনায় নানা ধরনের ক্ষতিকর, হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতে তার নিজের, পরিবারের ও সমাজের বিরাট ক্ষতি হয়।

মাদকাসক্তি ও ধূমপান মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এগুলো নেশাজাতীয় দ্রব্য। তাই এগুলো নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে রাসুল (স.) বলেছেন—

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

অর্থ : 'নেশাজাতীয় যেকোনো দ্রব্য মদ, আর যাবতীয় মদই হারাম।' (মুসলিম)

ধূমপান

মানুষের ক্ষতিকর বদঅভ্যাসগুলোর মধ্যে ধূমপান অন্যতম। হুক্কা, বিড়ি, চুরুট, সিগারেট ধূমপানের মধ্যে পড়ে। এতে যেমন শারীরিক ক্ষতি হয় তেমনি অর্থেরও অপচয় হয়। অপব্যয়কারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। অপব্যয়কারীকে আল্লাহ তায়ালা শয়তানের ভাই বলে আখ্যা দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন—

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط

অর্থ : "নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীগণ শয়তানের ভাই।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৭)

আল্লাহ আরও বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অপব্যয়কারীকে ভালোবাসেন না।" 'ধূম' কোনো খাবারের মধ্যে পড়ে না। এটি ক্ষুধা বা তৃষ্ণাও মেটায় না। এর দ্বারা কোনো উপকার হয় না বরং এটা মারাত্মক শারীরিক ক্ষতিসাধন করে এবং এর দ্বারা প্রচুর অর্থের অপচয় হয়। এ অপব্যয় মেটাতে ধূমপায়ীরা নিজেদের পরিবারে অর্থের সংকট ঘটায়। আত্মীয়স্বজনের সাথে অসদাচরণ করে। এ অপব্যয়ের অর্থ সংকুলানের জন্য নানা ধরনের অবৈধ পথে পা বাড়ায়। ফলে সামাজিক অনাচার সৃষ্টি হয়। সমাজে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়। ধূমপানের আর একটি ক্ষতির দিক হলো এটা খুব খারাপ গন্ধ ছড়ায়, যা অপরের জন্য ক্ষতিকর। এটা মানবাধিকারেরও পরিপন্থী।

২০২৫

মহানবি (স.) বলেছেন, 'মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে যেন কেউ মসজিদে না যায় ।' (নাসায়ি)

মুখে দুর্গন্ধ থাকলে মসজিদে অন্য নামাযির কষ্ট হয় । এমনিভাবে যানবাহনে ও সভা-সমিতিতে অন্য মানুষ ধূমপায়ীদের মাধ্যমে কষ্ট পায় যা ইসলামে অবৈধ করেছে ।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'ধূমপানে বিষপান ।' কারণ এতে বিষ আছে । নিকোটিন জাতীয় বিষ যা ধীরে ধীরে মানুষকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেয় । ধূমপানের ফলে মানুষের শরীরে নানারকমের অসুবিধার সৃষ্টি হয় । যেমন : নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, ব্রংকাইটিস, যক্ষা, ফুসফুসের ক্যানসার, গ্যাস্ট্রিক, ক্ষুধামন্দা, হৃদরোগ প্রভৃতি । ধূমপান পরিবেশকে নষ্ট করে । ধূমপানের সংস্পর্শে যারা আসে– মহিলা, শিশু, অধূমপায়ী সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় । পরীক্ষা করে দেখা গেছে দুটি সিগারেটে যে পরিমাণ নিকোটিন থাকে তা যদি কোনো মানুষের শরীরে ইনজেকশন দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তবে সে অবশ্যই মারা যাবে ।

ধূমপানের ফলে ইবাদতেও বিঘ্ন সৃষ্টি হয় । ধূমপায়ীর মুখের দুর্গন্ধে মুসল্লিদের ইবাদতেও বিঘ্ন সৃষ্টি হয় ।

মাদকাসক্তি

সাধারণত যে সকল খাদ্যবস্তু বা পানীয় মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটায়, জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে দেয়, দেহ ও মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সেগুলো গ্রহণ করাকে মাদকাসক্তি বলে । মাদকাসক্তি একটি জঘন্য বদঅভ্যাস । এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) বলেছেন–

'যা জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে দেয় তা মাদকদ্রব্য ।' (বুখারি)

মহানবি (স.) আরও ঘোষণা করেন—
'যেই বস্তুর বেশি পরিমাণের মধ্যে মাদকাসক্তির কারণ রয়েছে, তার অল্প পরিমাণও হারাম ।' (তিরমিযি)

নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুগুলোর মধ্যে রয়েছে মদ, তাড়ি, আফিম, গাঁজা, ভাং, চরস, হাশিশ, মারিজুয়ানা, হেরোইন, মরফিন, কোকেন, প্যাথেড্রিন, সঞ্জীবনী সুরা, বিভিন্ন প্রকার অ্যালকোহল ইত্যাদি । ওষুধ হিসেবে এগুলোর কিছু কিছু ব্যবহার করা হয় । তবে নেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ।

মহান আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক শর, ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। তোমরা এসব থেকে দূরে থাকো । আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে ।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৯০)

মাদকদ্রব্যের কুফল মানবজীবনে মারাত্মক বিপজ্জনক । যদিও সাময়িকভাবে মাদক আনন্দ দেয় বা শক্তি দেয় । কিন্তু এর ক্ষতিকর দিক খুবই সুদূরবিস্তৃত ও সর্বগ্রাসী । এ নেশার ফলে ব্যক্তি চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মারামারি, হত্যাসহ নানাপ্রকার সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ে । এছাড়াও মাদকাসক্ত ব্যক্তি অপুষ্টি, রুচিহীনতা, শারীরিক শীর্ণতা, লিভার ও কিডনি নষ্ট, ওজন কমে যাওয়া, শ্বাসনালির ক্ষতি প্রভৃতি সমস্যায়

ভোগে। কফ, কাশি, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগে দ্রুত আক্রান্ত হয়।

মাদকাসক্ত ব্যক্তি নামায, রোযা এবং যাবতীয় ইবাদতের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। সে সবসময় অসুস্থ থাকে। মাদকের নেশা তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখে, আর তাই সে পরকালে মহাশাস্তি ভোগ করবে। মহানবি (স.) বলেছেন—
'মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (দারিমি)

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে ধূমপানের অপকারিতাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১। মহান আল্লাহ্ মানুষকে অসংখ্য .... দান করেছেন।

২। .... সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে আত্মীয় বলে।

৩। মিথ্যা থেকে .... কাজের সূচনা হয়।

৪। গিবতের মাধ্যমে মানুষের মাঝে .... ও .... সৃষ্টি হয়।

৫। মুখে দুর্গন্ধ থাকলে ....অন্য নামাযির কষ্ট হয়।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১। যে সত্য কথা বলে	সন্তানের জন্য ওয়াজিব বা কর্তব্য।
২। পিতামাতার আদেশ-নিষেধ পালন করা	প্রতিবেশী।
৩। যে ব্যক্তি কামনা করে যে তার জীবিকা ও আয়ু বৃদ্ধি পাক	নিন্দনীয় কাজ।
৪। সামনে পিছনে ডানে বামে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত	সে যেন আত্মীয়দের সাথে সুন্দর আচরণ করে।
৫। গিবত একটি	তাকে সবাই ভালোবাসে ও সম্মান করে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। আখলাক বলতে কী বোঝ?

২। গিবত নিন্দনীয় কাজ কেন?

৩। আত্মীয়স্বজনের অধিকার বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। সত্যবাদিতার একটি বাস্তব ঘটনা বর্ণনা কর।

২। পিতামাতার অধিকারের উপর একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লেখ।

৩। ধূমপান ও মাদকাসক্তির কুফল বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আখলাখে যামিমাহ্ এর অর্থ কী?

ক. প্রশংসনীয় আচরণ খ. সত্যবাদিতা
গ. বিকৃত ঘটনা ঘ. নিন্দনীয় আচরণ

২। মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক, সৌহার্দ, বন্ধুত্ব গড়ে তোলার পিছনে নিম্নের কোনটির ভূমিকা অত্যধিক?

ক. আখলাকে যামিমাহ্ খ. আখলাখে হামিদাহ্
গ. আকাইদ ঘ. রিসালাত

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মোস্তাফিজ এ বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী। স্কুলে তার সহপাঠী, বন্ধুবান্ধবদের সাথে যেমন চমৎকার বন্ধুত্ব, তেমনি শিক্ষকদের সাথেও চমৎকার সম্পর্ক। শিক্ষকগণ তাকে অসম্ভব ভালোবাসে। শুধু কী তাই, সে পশুপাখি ও পরিবেশের সাথে ভালো আচরণ করে। এজন্য সবার নিকট সে খুবই প্রিয়।

৩। মোস্তাফিজের এই গুণগুলো নিম্নের কোনটির কারণে হয়েছে?

ক. তাজবিদ খ. আখলাক
গ. তাওহিদ ঘ. আকাইদ

৪। উদ্দীপকের মোস্তাফিজের কর্মকাণ্ডের ফলস্বরূপ–

i. শিক্ষকগণ সম্মান পাবে
ii. আমানতের খিয়ানত হবে
iii. পিতামাতার প্রতি উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

নাবিল ও জামিল সহপাঠী। একদিন জামিল ওযু করার জন্য তার ঘড়িটি খুলে ব্যাগে রেখে গেল। নামায পড়ে এসে সে তার ঘড়িটি ব্যাগে পেল না। জামিল অন্য সহপাঠীর মাধ্যমে জানতে পারল, নাবিল তার ঘড়িটি নিয়ে গেছে। নাবিলকে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলে সে অস্বীকার করল।

৫। **নাবিলের কাজটি কীসের অন্তর্ভুক্ত?**

ক. ধ্বংসের খ. মিথ্যার

গ. গিবতের ঘ. চুরির

৬। **নাবিল পরকালে লাভ করবে–**

i. জান্নাত

ii. আ'রাফ

iii. জাহান্নাম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের দুই বান্ধবী ফারজানা ও কাকলি। পড়াশোনা শেষে একই প্রতিষ্ঠানে একই সাথে একই পদে চাকরিতে জয়েন করে। চার বছর পর কাকলি পদোন্নতি পায়। এতে ফারজানা কিছুটা মনে কষ্ট পায়। কিছুদিন পর থেকে ফারজানা কাকলির বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কিছু দোষ-ত্রুটি অন্য সহকর্মীদের নিকট বলে বেড়াতে লাগলো। এতে অফিসের কর্মপরিবেশ কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়। একদিন তাদের অফিসের অফিস সহায়ক বৃদ্ধ হামিদা বেগম ফারজানা বেগমকে বলল 'আপা, কোনো অবস্থাতেই কাকলি আপার অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কোনো সমালোচনা করা ঠিক নয়।'

ক. সিদক-এর অর্থ কী?

খ. আখলাকে হামিদাহ্ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. ফারজানার কর্মকাণ্ডে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের হামিদা বেগমের বক্তব্যের তাৎপর্য মূল্যায়ন কর।

২। গাজীপুরের শান্তিনগর গ্রামে ডাক্তার মফিদুল হক একটি বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তোলেন। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে এসে অনেক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা এখানে থাকেন। তাঁরা সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে গল্প করে সময় কাটান। অনেকে জীবনের অনেক কাহিনি চেপে রাখতে পারলেও অনেকেই পারেন না। একদিন আহমেদুল হক সাহেব বললেন— উনার রুমেই থাকতেন দেশের একজন সাবেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও নামকরা সাহিত্যিক। তাঁর মৃত্যুর পর ঢাকায় অবস্থানরত তাঁর চারজন সন্তানকে খবর দেওয়া হলেও তারা শেষবারের মতো বাবার মুখটি দেখার জন্য আসলো না। সাথে সাথেই অন্যরা বলে উঠল, 'এটি তো এখানে অনেকবারই দেখেছি।' আমাদের ভয় সেখানেই।

ক. গিবত কী?

খ. আখলাকে হামিদাহ্ কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের আহমেদুল হক সাহেব-এর মন্তব্যটিতে সন্তানদের আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বয়স্কদের প্রতি তাঁদের সন্তানদের আচরণের শাস্তি ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

আদর্শ জীবন বলতে বোঝায় যে জীবন অনুসরণ করলে জীবন সুন্দর ও সুগঠিত হয়। পৃথিবীতে এমন অনেক মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যাঁদের জীবনচরিত অন্যের জন্য আদর্শ। সুতরাং বাস্তব জীবনে এসব মনীষীর সমাজসেবামূলক কাজ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মত্যাগ, ক্ষমা, পরমতসহিষ্ণুতা ও দেশপ্রেমসহ অন্যান্য গুণ অনুসরণ ও অনুকরণ করলে সুন্দর সুশৃঙ্খল ও সফল জীবন লাভ করা যায়।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- আদর্শ জীবনচরিতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মহানবি (স.)-এর পরিচয়, সততা, বিশ্বস্ততা, সমাজসেবা, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও তাঁর অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- পরিচয়সহ হযরত আবু বকর (রা.)-এর দানশীলতা, ত্যাগ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান বর্ণনা করতে পারব।
- সাম্য, গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ, দেশপ্রেম ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর অবদান উল্লেখ করতে পারব।
- হযরত খাদিজা (রা.)-এর পরিচয়, দানশীলতা, সহমর্মিতাসহ তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর পরিচয়, ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর আবদান বর্ণনা করতে পারব।
- হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.)-এর পরিচয়, মানবপ্রেমসহ তাঁর চরিত্রের মহৎ গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনাদর্শ

আরবের অবস্থা

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্মের সময় আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল ভয়াবহ ও জঘন্য। আরবের লোকেরা ছিল নানা পাপে লিপ্ত। মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া-বিবাদ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুন্ঠন, দুর্নীতি ও অরাজকতা করে তাদের জীবন চলত। তারা এক আল্লাহর পরিবর্তে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করত। সমগ্র আরবদেশ বর্বরতা ও প্রকৃতি পূজায় নিমজ্জিত ছিল। কাব্যচর্চা, গান ও বাগ্মীতায় অগ্রসর থাকলেও নৈতিক চরিত্রে আরব সমাজ পিছিয়ে পড়েছিল। হাটে-বাজারে পণ্যের মতো মানুষ বেচাকেনা হতো। এদের জীবন-মৃত্যু মনিবের খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করত। মনিবরা এদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালাত। ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণভাবে নারীদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। নারীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা বা অধিকার ছিল না। এমনকি সে সময় জীবন্ত মেয়ে শিশুদের গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেওয়া হতো। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে পাঠান। তাঁর আগেও পৃথিবীতে আরও অনেক নবি-রাসুল এসেছেন। আমাদের নবি হলেন সর্বশেষ নবি। সকল নবির সেরা নবি, বিশ্বনবি।

জন্ম ও পরিচয়

হযরত মুহাম্মদ (স.) আমাদের প্রিয় নবি। তিনি ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা। তিনি মাতৃগর্ভে থাকতেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। জন্মগ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মদ ও আহমাদ।

মহানবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পাদ্রি বুহাইরার ভবিষ্যদ্বাণী

আরবদের বনু সা'দ গোত্রের মেয়ে ধাত্রী হালিমার উপর শিশু মুহাম্মদের লালনপালনের দায়িত্ব পড়ে। তিনি পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁকে নিজের সন্তানের মতো স্নেহ-মমতায় লালনপালন করেন। এরপর মুহাম্মদ (স.) মা আমিনার কোলে ফিরে আসেন। তিনি মা আমিনার সীমাহীন আদরযত্নে বড় হতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর কপালে এ আদরও বেশিদিন জুটল না। তাঁর মাও মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। অল্প বয়সেই তিনি পিতামাতা উভয়কে হারিয়ে ইয়াতিম হয়ে যান। বিশ্বের বুকে তিনি তখন একা, নিঃসঙ্গ ও অসহায় বালক। উম্মে আয়মান নামক একজন পরিচারিকা তাঁকে দাদা আব্দুল মুত্তালিবের হাতে তুলে দেন। দাদা অত্যন্ত আদরযত্নে তাঁকে লালনপালন করতে থাকেন। তাঁর বয়স যখন আট বছর তখন দাদাও তাঁকে ছেড়ে পরলোকগমন করেন। এবার তিনি চাচা আবু তালিবের হাতে বড় হতে থাকেন। চাচার সংসারে ছিল অভাব-অনটন। তিনি চাচার ব্যবসায়িক কাজে সহযোগিতা করতেন ও মেষ চরাতেন। চারিত্রিক সকল ভালো গুণ তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তিনি অহংকার, অপব্যয়, অর্থহীন ও অনৈতিক কথা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেন এবং তিনি অন্যের দোষ খোঁজা ও কাউকে লজ্জা দেওয়া থেকেও বিরত থাকতেন। সর্বদা মানুষের সাথে হাসিখুশি কথা বলতেন। অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হতেন। মানবতার কল্যাণে নিজের সম্পদ অকাতরে ব্যয় করতেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী। তাঁকে আপন-পর সকলেই আল-আমিন (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করেন। এক কথায় তিনি পৃথিবীর সকল প্রাণী ও জীবজন্তুর উপকারী বন্ধু ছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বয়স যখন ১২ বছর ২ মাস ১০ দিন তখন চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া রওয়ানা হলেন। তিনি বসরায় পৌঁছলে বুহাইরা (জারজিস) নামক একজন খ্রিষ্টান পাদ্রির সাথে দেখা হয়। তিনি মুহাম্মদ (স.)-কে চিনতে পেরে বলেন, ইনিই শেষ জামানার নবি ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল। পাদ্রি আবু তালিবকে বলেন, ওকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন, ইহুদিরা তাঁর ক্ষতি করতে পারে। এ পরামর্শ অনুযায়ী চাচা আবু তালিব কয়েকজন ভৃত্যের সঙ্গে প্রিয় ভাতিজাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেন।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স.)

ওকাজ মেলায় জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে ফিজার যুদ্ধ শুরু হয়। তা একটানা পাঁচ বছর চলতে থাকে। এতে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে। মহানবি (স.) এসব হানাহানি ও রক্তারক্তি অবস্থা দেখে ব্যথিত হলেন। কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি শান্তিকামী কয়েকজন যুবককে নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' নামে একটি শান্তিসংঘ গঠন করেন। এর মাধ্যমে তিনি তৎকালীন আরবের চলমান হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি ও হানাহানি বন্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টার ফলে সমাজে কিছুটা শান্তি ফিরে আসে। সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও গোত্রে গোত্রে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয় এবং তাঁর সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আপন-পর সকলেই তাঁকে আল-আমিন (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করেন।

কুরাইশগণ বহুদিনের পুরাতন কাবা ঘর সংস্কারের কাজ হাতে নিল। কাবা ঘর সংস্কারের কাজ সমাপ্ত হলো। কিন্তু পবিত্র হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্থাপন করা নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হলো। এ ঝগড়া বিভিন্ন গোত্রে ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই এ পাথর স্থাপনের মতো মহৎ কাজের অংশীদার হতে চাইল। কেউ ছাড় দিতে রাজি হলো না। তাই গোত্রসমূহের মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হলো। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো আগামী দিন সকালবেলা সবার আগে যিনি কাবা ঘরে প্রবেশ করবেন তিনিই এ বিবাদ মীমাংসা করবেন। তিনি যা সিদ্ধান্ত দেবেন সকলেই তা মেনে নেবে। সকালবেলা দেখা গেল হযরত মুহাম্মদ (স.) সবার আগে কাবা ঘরে প্রবেশ করেছেন। এটা দেখে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করল এবং বলে উঠল, 'আল-আমিন এসেছেন, সঠিক সিদ্ধান্ত হবে।' হযরত মুহাম্মদ (স.) একখানা চাদর বিছিয়ে নিজ হাতে পাথরটি চাদরের মাঝখানে রাখলেন। তারপর সকল গোত্রের সরদারকে ডেকে চাদর ধরতে বললেন। তারা সকলে মিলে চাদরটি বহন করে যথাস্থানে নিয়ে গেল, হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজ হাতে পাথরখানা কাবার দেয়ালে বসিয়ে দিলেন। ফলে জাতি একটি ভয়াবহ যুদ্ধ হতে বেঁচে গেল এবং সকলে পাথরটি বহনের সম্মান পেয়ে খুশি হলেন।

নবুয়তপ্রাপ্তি ও আরবের লোকদের প্রতিক্রিয়া

হযরত মুহাম্মদ (স.) শৈশবকাল হতেই মানুষের মুক্তি ও শান্তির কথা ভাবতেন। যুবক বয়সে তাঁর এ ভাবনা আরও গভীর হতে থাকে। হযরত খাদিজা (রা.)-এর সাথে বিবাহের পর তিনি সাধনা ও ধ্যান আরও বাড়িয়ে দেন। তিনি মক্কার অদূরে হেরা গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তিনি সর্বদা চিন্তা করতেন, কীভাবে মানবজাতিকে মূর্তিপূজা, অগ্নিপূজা ও শিরক হতে মুক্ত করবেন ও এক আল্লাহর পথে নিয়ে আসবেন। এভাবে তিনি হেরা গুহায় প্রায় ১৫ বছর ধ্যানমগ্ন থাকেন। মাঝে মাঝে বাড়ি আসতেন, অবার হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যানে মগ্ন হতেন। অবশেষে ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র রমযান মাসের ২৭ তারিখ নবুয়ত লাভ করেন।

নবুয়ত লাভের পর তিনি লোকদের এক আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দেন। মক্কার কাফিররা তাতে বাধা দেয়। তাই তিনি গোপনে ইসলামের পথে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান। আরবের প্রভাবশালী মহল সবসময় তাঁর কাজের বিরোধিতা করতে থাকে। তারা হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর অনুসারিদের নানাভাবে নির্যাতন করতে থাকে। হযরত মুহাম্মদ (স.) অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে তাদের অত্যাচার সহ্য করেন এবং নীরবে এক আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি মানুষকে আহবান করতে থাকেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) আরব সমাজের কুসংস্কার দূর করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঠ ২

হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনাদর্শ

পরিচয়

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশের তায়িম গোত্রে ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্য নাম আব্দুল্লাহ, উপাধি সিদ্দিক ও আতিক। পিতার নাম উসমান, ডাকনাম আবু কুহাফা এবং মাতার নাম সালমা, ডাকনাম উম্মুল খায়ের। তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন বয়সের দিক থেকে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চেয়ে তিন বছরের ছোট। মহানবি (স.)-এর প্রায় সমবয়সী হওয়ায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর পিতা ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শ্বশুর।

ইসলাম গ্রহণ

পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবু বকর (রা.)। তিনি রাসুল (স.)-কে খুব বিশ্বাস করতেন। একদা তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইয়ামেনে গমন করেন। মক্কায় ফিরে শুনলেন হযরত মুহাম্মদ (স.) নবি দাবি করছেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার করছেন। তিনি রাসুল (স.)-এর দরবারে হাজির হয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

চরিত্র ও গুণাবলি

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন স্বল্পভাষী, সাহসী, ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি ছিল তাঁর অটল বিশ্বাস। রাসুল (স.)-এর মে'রাজের (ঊর্ধ্বগমন) ঘটনা অকপটে একমাত্র তিনিই বিশ্বাস করেন। তাই তিনি সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত হন। সততা, ধর্মভিরুতা ও বদান্যতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। দুঃখী ও আর্তের সেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। এজন্য তিনি আরব সমাজে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

তিনি ছিলেন নম্র ও ভদ্র প্রকৃতির লোক। কুরআন পাঠের সময় তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতো। ইসলামের সেবায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর দান অতুলনীয়। তিনি ইসলামের জন্য তাঁর সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মসজিদে নববি ও হযরত মুহাম্মদ (স.) -এর বাসগৃহ নির্মাণ এবং তাবুক অভিযানে তিনি অর্থ ব্যয় করেন। তিনি হযরত বেলাল (রা.)-সহ অসংখ্য ক্রীতদাসকে ক্রয় করে স্বাধীন ও মুক্ত করে দেন।

ইসলাম প্রচার

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) রাসুল (স.)-এর সঙ্গে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত হন। মক্কার আশপাশের গোত্রে তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন। হজের মৌসুমে বিভিন্ন তাঁবুতে গিয়েও তিনি ইসলামের প্রতি লোকদের আহবান করেন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কুরাইশ বংশের বিশিষ্ট যুবক উসমান (রা.), যুবাইর (রা.), আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রা.), সা'দ (রা), ত্বালহা (রা.)-এর মতো আরও অনেক সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করেন।

মদিনায় হিজরত

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হিজরতের সাথী ছিলেন। রাসুল (স.) হিজরতের আদেশপ্রাপ্ত হন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে অবগত করেন। তিনি রাসুল (স.) থেকে হিজরতের কথা শুনার পর রাত্রে আর ঘুমাতেন না, অপেক্ষায় থাকতেন কখন রাসুল (স.) এসে তাঁর সাথে হিজরত করার জন্য ডাক দেবেন। গভীর রাত্রে তিনি রাসুল (স.)-এর ডাকে সাড়া দেন এবং উভয়ে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন। পথিমধ্যে তাঁরা কাফির শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাওর নামক পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন। সেখান থেকে মদিনায় হিজরত করেন।

খলিফা নির্বাচন

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওফাতের পর হযরত উমর (রা.) ও অন্য সাহাবিগণ হযরত আবু বকর (রা.)-কে খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে পরামর্শ করে তাঁকে ৮ই জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা নির্বাচন করেন। রাসুল (স.)-এর ওফাতের পর মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ সময় কিছু লোক নবি হওয়ার মিথ্যা দাবি করে, আবার কেউ কেউ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, কেউ কেউ ইসলাম ত্যাগ করে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কঠোরভাবে সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর করেন ও শান্তি স্থাপন করেন। তাঁর শাসনামলে ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ামামার যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে অনেক হাফিয ও ক্বারি সাহাবি শহিদ হন। এরপর তিনি কুরআন সংরক্ষণ ও সংগ্রহ করার জন্য হযরত যায়েদ ইবনু সাবিত (রা.)-কে নির্দেশ দেন। হযরত যায়েদ ইবনু সাবিত (রা.) আদেশপ্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন সাহাবি থেকে গাছের বাকলে, পশুর হাড় ও চামড়ায় এবং মসৃন পাথরে লিখিত কুরআনের আয়াতসমূহ সংগ্রহ করেন।

ওফাত

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ২৩শে আগস্ট ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর কামরায় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পাশে মদিনায় সমাহিত করা হয়।

রাসুল (স.)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর (রা.) ইসলাম রক্ষায় অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর আদর্শ সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত আবু বকর (রা.)-এর চরিত্রের দুটি গুণ লিখে একটি প্ল্যাকার্ড তৈরি করবে।

পাঠ ৩

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর জীবনাদর্শ

পরিচয়

হযরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে কুরাইশ বংশের আদি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাকনাম আবু হাফ্স, পিতার নাম খাত্তাব, মাতার নাম হান্‌তামা। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ফারুক (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধিতে ভূষিত হন। বাল্যকালে তিনি উট

চরাতেন, যৌবনের শুরুতে যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশ তালিকা সম্পর্কে পারদর্শী ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির সময় কুরাইশ বংশে ১৭ জন ব্যক্তি লেখাপড়া জানতেন, তিনি তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত উমর ফারুক (রা.) ইসলাম গ্রহণের আগে আবু জাহালের নেতৃত্বে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তিনি মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাতেন। এমনকি তাঁর চাকরানীও ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তার উপর নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকেননি। তিনি একবার উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে মুহাম্মদ (স.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হন। পথে নঈম ইবনু আব্দুল্লাহর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। নঈম বলল, 'কোথায় যাচ্ছ উমর?' উত্তরে রাগস্বরে বললেন, 'মুহাম্মদকে হত্যা করতে যাচ্ছি।' এ কথা শুনে নঈম বলল, 'আগে তোমার ঘর সামলাও। তোমার বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেছে।' তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে বোনের বাড়ি গেলেন। তাঁর বোন ও ভগ্নিপতি তখন পবিত্র কুরআনের সূরা তা-হা পাঠ করছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত উমর (রা.)-এর উপস্থিতি তাঁদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করলেও তাঁরা ইমানি চেতনা থেকে সরে যাননি। হযরত উমর (রা.)-এর জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা কুরআন পাঠের কথা জানান। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের উপর আঘাত করতে থাকেন। তখন তাঁর বোনের শরীর থেকে রক্ত ঝরা দেখে তাঁর মনে দয়ার উদ্রেক হয়। হযরত উমর (রা.) তাঁদের বললেন, 'তোমরা কী পাঠ করছিলে তা আমাকে দেখাও।' উত্তরে তাঁর বোন বলল, 'কুরআন পাঠ করছিলাম। এটা পবিত্র গ্রন্থ, অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা যায় না।' পরে তিনি পবিত্র হয়ে এলে তাঁকে কুরআন মজিদ পড়তে দেওয়া হয়। তখন তাঁর মনে চিন্তার পরিবর্তন হয়। তিনি তখন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসুল (স.)-এর নিকট যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সে সময় রাসুল (স.) সাফা পাহাড়ের পাদদেশে হযরত আরকাম (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। কোষমুক্ত তরবারিসহ হযরত উমর (রা)-এর উপস্থিতি সাহাবিদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। হযরত উমর (রা.) রাসুল (স.)-এর কাছে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'হে আল্লাহর নবি! আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করুন। যে তরবারি নিয়ে আপনার শিরশ্ছেদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম, আজ হতে সে তরবারি উমরের হাতে ইসলামের শত্রু নিধনে ব্যবহৃত হবে।' হযরত উমর (রা.) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হাতে তখন ইসলাম গ্রহণ করেন। মূলত তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দোয়ারই ফল। রাসুল (স.) তাঁর জন্য এভাবে দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! উমর ইবনু হিশাম (আবু জাহাল) অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব এ দুইজনের একজনকে ইসলামে প্রবেশ করার তাওফিক দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।'

খলিফা নির্বাচন

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ইন্তিকালের পরে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী হযরত উমর (রা.) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। তা অধিকাংশ সাহাবি সমর্থন করেন।

শাসনব্যবস্থা

হযরত উমর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। এ সময় রোম, পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও ফিলিস্তিন মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। রাজ্য শাসনে তিনি রাসুল

(স.)-এর আদর্শ অনুসরণ করতেন। আইনের চোখে সকলকে সমানভাবে দেখতেন। এমনকি মদ্যপানের অপরাধে স্বীয় পুত্র আবু শামাকে শাস্তিদানে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন যেমন কঠোর তেমনি মানুষের দুঃখকষ্টে তিনি ছিলেন অতি কোমল। তিনি সাধারণ প্রজাদের অবস্থা জানার জন্য রাতের আঁধারে একাকী বের হয়ে পড়তেন। প্রয়োজনে তিনি নিজের কাঁধে খাদ্যসামগ্রী বহন করে গরিব-দুঃখী মানুষের মাঝে বিতরণ করতেন। তাঁর শাসনামলে রাজ্যে কোনো অভাব-অনটন ছিল না। সে সময় কৃষিকাজে ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। তিনি ডাক বিভাগ প্রবর্তন, সাম্য ও ন্যায়ের বাস্তব শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিজরি সন প্রবর্তন করেন। জনকল্যাণে তিনি অসংখ্য মসজিদ, বিদ্যালয়, সেতু, সড়ক, হাসপাতাল নির্মাণ করেন। পানির জন্য তিনি অনেক খালও খনন করেন। তাঁর সময়েই আরবে সর্বপ্রথম আদমশুমারি চালু হয়। ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় তিনি বাইতুলমাল থেকে প্রাপ্ত কাপড় সেই পরিমাণ গ্রহণ করতেন যে পরিমাণ সকলের জন্য নির্ধারিত ছিল। তাছাড়া জেরুজালেমে যাওয়ার পথে ভৃত্যকে উটের পিঠে চড়িয়ে নিজে উটের রশি ধরার দৃষ্টান্ত একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরল ঘটনা। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, 'অল্প কথায় বলা যায়, হযরত উমর (রা.)-এর সরলতা ও কর্তব্যজ্ঞান ছিল তাঁর জীবনাদর্শ। ন্যায়পরায়ণতা ও একনিষ্ঠতা ছিল তাঁর শাসনামলের মূলনীতি।'

চারিত্রিক গুণাবলি

হযরত উমর (রা.) খুব সহজসরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। অর্ধপৃথিবীর শাসক হয়েও তাঁর কোনো দেহরক্ষী ছিল না, খেজুরপাতার আসন ছিল তাঁর সিংহাসন। জনসেবাই ছিল তাঁর ব্রত। ইবাদত বন্দেগিতে অতিবাহিত হতো তাঁর অধিকাংশ সময়। জাগতিক লোভ-লালসা ও জাঁকজমক তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর মধ্যে কঠোরতা ও কোমলতার ব্যাপক সমন্বয় ঘটেছিল।

শাহাদতবরণ

হযরত উমর (রা.) তাঁর গৌরবময় শাসনামলের দশম বছরে মসজিদে নববিতে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় কুফার শাসনকর্তা হযরত মুগীরা (রা.) এর ভৃত্য অগ্নিপূজক আবু লুলুর বিষাক্ত ছুরিকাঘাতে আহত হন। তিনি আহত হওয়ার তৃতীয় দিন হিজরি ২৩ সনের ২৭শে জিলহজ বুধবার (৩রা নভেম্বর) ৬৩ বছর বয়সে শাহাদতবরণ করেন। হযরত ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন,'আমার ধারণা হযরত উমর (রা.) যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তখন দশভাগ ইলমের নয়ভাগ তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন।' (তাবারানি) আমরা হযরত উমর (রা.)-এর মহান আদর্শ মেনে চলব এবং সে অনুসারে জীবন গড়ব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত উমর (রা.)-এর ন্যায়বিচার ও সুশাসন সম্পর্কে বাড়ির কাজ হিসেবে একটি টীকা লিখে নিয়ে আসবে।

পাঠ ৪

হযরত খাদিজা (রা.)-এর জীবনাদর্শ

পরিচয়

মহানবি (স.)-এর প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.)। তিনি বিখ্যাত কুরাইশ বংশের আব্দুল উয্যা নামক পরিবারে ৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন খোয়াইলিদ ইবনে আসাদ আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি। তাঁর মাতা ফাতিমা বিনতে যায়েদ। বিশ্বের ইতিহাসে যে কয়জন নারী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। সম্পর্কের দিক থেকে তিনি ও রাসুলুল্লাহ (স.) একই বংশের ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'তাহিরা' (পুণ্যবতী)। পারিবারিক সূত্রে সম্পদশালিনী বলে তাঁর সুনাম ছিল সমগ্র আরবজুড়ে।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সঙ্গে পরিচয় ও বিবাহ

হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর ব্যবসা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময় লোক নিয়োগ করতেন। তিনি মহানবি (স.)-এর সততা, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার কথা শুনে তাঁকে তাঁর ব্যবসা দেখাশোনা করার জন্য অনুরোধ করেন। মহানবি (স.) তাঁর ব্যবসার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ব্যবসায়িক কাজে মালামাল নিয়ে সিরিয়ায় গমন করেন। এ ব্যবসায় হযরত খাদিজা (রা.) ব্যাপক লাভবান হন।

হযরত মুহাম্মদ (স.) সিরিয়া থেকে ফেরার পর হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা ও উন্নত চরিত্র সম্পর্কে অবগত হন। তিনি যুবক মুহাম্মদ (স.)-এর অসাধারণ চরিত্রগুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব করেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বয়স ছিল তখন ২৫ বছর। আর হযরত খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর। রাসুল (স.)-এর চাচা আবু তালিবের সম্মতিক্রমে বিশটি উট মোহরের বিনিময়ে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর সকল সম্পদের দায়দায়িত্ব রাসুল (স.)-এর উপর ছেড়ে দেন এবং নবি করিম (স.)-কে তাঁর ইচ্ছামতো সম্পদ খরচ করার অনুমতি দেন। রাসুল (স.) অকাতরে সম্পদ গরিব-দুঃখীদের মধ্যে দান করেন।

সন্তান-সন্ততি

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত সুখের। হযরত খাদিজা (রা.)-এর গর্ভে মহানবি (স.)-এর তিন পুত্রসন্তান–কাছিম, আব্দুল্লাহ ও তাহির এবং চার কন্যা–হযরত জয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পুত্রগণ শৈশবেই দুনিয়া হতে বিদায় নেন। তাতে নবি করিম (স.) অত্যন্ত মর্মাহত হন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত খাদিজা (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। হেরা গুহায় নবুয়তপ্রাপ্ত হয়ে মহানবি (স.) যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে ছিলেন তখন হযরত খাদিজা (রা.) স্বীয় স্বামীর অবস্থা বুঝতে পেরে বুদ্ধিমত্তার সাথে তাঁকে এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, 'ভীত হওয়ার কিছু নেই, আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না, কেননা আপনি আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন, দুস্থ অভাবীদের সাহায্য করেন, মেহমানদের

আপ্যায়ন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করেন।' এরপর হযরত খাদিজা (রা.) আসমানি কিতাবে অভিজ্ঞ ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের কাছে তাঁকে নিয়ে যান। ওয়ারাকা হেরা গুহায় সংঘটিত ঘটনা শুনে বললেন, 'ভীত হওয়ার কিছু নেই, তিনি সে 'নামুস' (জিবরাইল) যিনি হযরত মুসা (আ.)-এর নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন।' পরবর্তীকালে মহানবি (স.) আল্লাহর নির্দেশে ইসলাম প্রচার শুরু করলে হযরত খাদিজা (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি নবুয়তের দশম বছরে রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে নবি করিম (স.) গভীরভাবে শোকাহত হন।

চারিত্রিক গুণাবলি

হযরত খাদিজা (রা.) জাহিলি যুগে জন্মগ্রহণ করেও সৎ চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন। কখনো কোনো অন্যায় ও অশ্লীল কাজে যোগ দেননি। মহানবি (স.)-এর প্রতি ছিল তাঁর প্রবল ভালোবাসা। তিনি ইসলাম প্রচারে হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে সাহস ও উৎসাহ প্রদান করতেন। ইসলামের খাতিরে তাঁর সকল সম্পদ দান করার কারণে আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.)-এর স্বামীভক্তি ছিল অতুলনীয়। যখন রাসুল (স.) বাইরে যেতেন তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করতেন। আবার তিনি (স.) কখনো বিমর্ষ অবস্থায় বাড়ি ফিরলে হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে সহানুভূতির সাথে সান্ত্বনা দিতেন ও সাহস যোগাতেন।

শ্রেষ্ঠত্ব

মহানবি (স.) বলেছেন, 'হযরত খাদিজা (রা.) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নারী।' (বুখারি)। একদা হযরত জিবরাইল (আ.) হযরত খাদিজা (রা.) সম্পর্কে রাসুল (স.)-কে বললেন, 'তাঁর প্রভু (আল্লাহ) এবং আমার পক্ষ থেকে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাবেন এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন।' (বুখারি ও মুসলিম)। আরও বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আয়েশা (রা.)-এর এক অভিমানের জবাবে রাসুল (স.) বলেন, 'না, আল্লাহ খাদিজার চেয়ে কোনো মহৎ নারী আমাকে দেননি। তিনি এমন সময় আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন, যখন সবাই আমাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যা দিয়েছেন। আমার বিপদের দিনে সবাই যখন আমাকে নিরাশ করেছে তখন তিনি আমাকে অর্থ সাহায্য করেছেন।' (মুসনাদে আহমাদ)। অন্য এক হাদিসে নবি করিম (স.) বলেছেন, 'বিশ্বের সকল নারীর উপর চারজনের সম্মান রয়েছে– হযরত মারিয়াম (আ.), হযরত খাদিজা (রা.), হযরত ফাতিমা (রা.) ও হযরত আসিয়া (আ.)।' বর্তমান বিশ্বের নারীগণ যদি হযরত খাদিজা (রা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে, তাহলে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন অনেক সুন্দর হবে।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত খাদিজা (রা.)-এর উত্তম গুণাবলির আলোকে একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৫

হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর জীবনাদর্শ

জন্ম ও পরিচয়

হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবু হানিফা (র.) ৮০ হিজরি ৭০০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম নোমান, পিতার নাম সাবিত। কিন্তু তিনি আবু হানিফা নামে খ্যাত।

শৈশবকাল

জন্মগতভাবেই ইমাম আবু হানিফা (র.) অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই পবিত্র কুরআনের হাফিয হন। তিনি কুরআন, হাদিস ও ফিকাহশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি তৎকালীন মুহাদ্দিস ও ফকিহ হাম্মাদ (র.)-এর কাছে জ্ঞানলাভ করেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করে জীবন নির্বাহ করতেন।

অবদান

ইমাম আবু হানিফা ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকাহশাস্ত্রবিদ। মানুষ যাতে সহজ ও সঠিকভাবে শরিয়তের বিষয়গুলো পালন করতে পারে সেজন্য তিনি শ্রেষ্ঠ ফিকাহবিদদের সমন্বয়ে একটি 'ফিকাহ সম্পাদনা পরিষদ' গঠন করেন। তাঁর সম্পাদিত প্রায় তিরাশি হাজার মাসআলা সংবলিত 'কুতুবে হানাফিয়্যা' রচিত হয়। ইমাম আবু হানিফা কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের সমন্বয়ে যুক্তিভিত্তিক ও সহজসরল ফিকাহ প্রণয়ন করেন। এ কারণে তাঁর ফিকাহ মুসলমানদের নিকট অতিপ্রিয়। বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে তাঁর মাযহাবের অনুসারী বেশি। ইমাম আবু ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম যুফার (র.) ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনু মুবারক (র.) প্রমুখ তাঁর শিষ্য ছিলেন।

ইমাম শাফিয়ী (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'মানুষ ফিকাহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মুখাপেক্ষী।' ব্যক্তি হিসেবে ইমাম আবু হানিফা ছিলেন উঁচুমানের ইবাদতকারী ও মুত্তাকি। কথায় ও কাজে তাঁর অপূর্ব মিল ছিল। তাঁর জীবনে কোনো লোভ-লালসা ছিল না। তিনি অত্যন্ত সহজসরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন।

আব্বাসি খলিফা আল মানসুর তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ কারণে তাঁকে দৈহিক নির্যাতন ও কারাবরণ করতে হয়। তিনি ১৫০ হিজরি ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আল মানসুর কর্তৃক প্রয়োগকৃত বিষক্রিয়ার ফলে কারাগারেই শাহাদতবরণ করেন।

আমরা ইমাম আবু হানিফা (র.) সম্পর্কে আরও বেশি জানব এবং তাঁর ফিকাহশাস্ত্রের উপর জ্ঞানলাভ করে সুন্দর জীবন গড়ব।

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বসে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ফিকাহশাস্ত্রে জ্ঞানের জনপ্রিয়তা লাভের কারণগুলো চিহ্নিত করবে।

পাঠ ৬

হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-এর জীবনাদর্শ

হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.) ৪৭০ হিজরি মোতাবেক ১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের জিলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থানের নামানুসারে তাঁকে জিলানি বলা হয়। তাঁর উপনাম আবু সালেহ, উপাধি মুহিউদ্দীন, কুতুবে রাব্বানি ইত্যাদি। তাঁর পিতার নাম আবু সালেহ মুসা। তিনি হযরত ফাতিমা (রা.)-এর পুত্র ইমাম হাসান (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর মাতার নাম উম্মুল খায়ের ফাতিমা। তিনি ইমাম হোসাইন (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। এজন্য হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-কে আওলাদে রাসুল বলে গণ্য করা হয়।

এ মহান ওলি বাল্যকাল হতেই শান্ত, নম্র, ভদ্র, চিন্তাশীল ও জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। শৈশবে তিনি কুরআন মুখস্থ করেন। জিলানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৮ বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বাগদাদ গমন করেন। নিজামিয়া মাদ্রাসায় তাফসির, হাদিস, ফিকাহ, উসুল, ধর্মতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস ও দর্শনে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.) সাধারণ মানুষ থেকে ব্যতিক্রমী একজন মহান সাধক ও তাপস হবেন তা তাঁর শৈশবকালের একটি কাহিনি থেকে বোঝা যায়। বর্ণিত রয়েছে যে, দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় তিনি রমযান মাসে দিনের বেলায় মাতৃদুগ্ধ পান থেকে বিরত থাকতেন। তাঁর মা তাকে দুধ পান করাতে গেলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.) শরিয়তের জ্ঞানার্জনের পর মা'রেফাতের (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান-লাভের জন্য বাগদাদের সুফি-দরবেশদের দরবারে যাতায়াত শুরু করেন। তাঁর সাথে সাধক হযরত হাম্মাদান (রা.)-এর পরিচয় ঘটে। তিনি তাঁর সাহচর্যেই সুফিতত্ত্বে জ্ঞানলাভ করেন।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.) আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য ২৫ বছর লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান। ৫২১ হিজরির শেষ ভাগে পুনরায় লোকালয়ে ফিরে আসেন এবং দীন প্রচার শুরু করেন।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-এর নিকট শিক্ষা লাভের জন্য অসংখ্য আলেম সমবেত হতেন। তিনি বুধবার স্থানীয় ঈদগাহে সকালবেলায় বক্তৃতা করতেন। কিন্তু শ্রোতার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ঈদগাহটির আয়তন বৃদ্ধি করা হয় এবং সেখানে একটি মুসাফিরখানাও স্থাপন করা হয়।

জীবনের শেষ দিকে তিনি দিনের বেলায় খুতবা ও ফতোয়া প্রদানে ব্যস্ত থাকতেন। নিষিদ্ধ পাঁচ দিন ব্যতীত সারা বছর রোযা রাখতেন।

তিনি ছিলেন অভাবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁর ছাত্রজীবনে বাগদাদে অনটন দেখা দেয়। তিনি তার নিকট থাকা স্বর্ণমুদ্রা থেকে অভাবীদেরকে দান করতেন এবং নিজে খেয়ে না খেয়ে জীবন অতিবাহিত করতেন। অসহায়দের প্রতি তাঁর দরদ কেমন ছিল, তা তাঁর কথা থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন, 'আফসোস তোমার

নিকট পুরোদিনের খাবার মওজুদ আছে। অথচ তোমার নিকটতম প্রতিবেশী উপবাস থাকছে। তোমার ঈমান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি তুমি নিজের জন্য যা চাও অন্যের জন্য তা না চাও।'

এ মহান ওলি বড়পীর নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ৯০ বছর বয়সে ৫৬১ হিজরি সনের ১১ রবিউস সানি তারিখে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাজার বাগদাদে অবস্থিত। আমরা বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-এর আদর্শে আমাদের জীবন গড়ব, সদা সর্বদা সত্য কথা বলব, অভাবী ও দুস্থদের সাহায্য ও সেবা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-এর চরিত্রের মহৎ গুণাবলির একটি তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১। হযরত মুহাম্মদ (স.) .... খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

২। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন.............।

৩। হযরত উমর (রা.) .... খ্রিষ্টাব্দে খলিফা নির্বাচিত হন।

৪। হযরত খাদিজা (রা.)-এর উপাধি ছিল .... ।

৫। .... অল্প বয়সেই পবিত্র কুরআনের হাফিয হন।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১। নারীদের কোনো সামাজিক	শান্তির কথা ভাবতেন।
২। মনিবরা ক্রীতদাসদের প্রতি অমানুষিক	নির্যাতন চালাত।
৩। হযরত মুহাম্মদ (স.) সকল জীবজন্তুর	অধিকার ছিল না।
৪। জাতি একটি ভয়াবহ যুদ্ধ হতে	বেঁচে গেল।
৫। হযরত মুহাম্মদ (স.) শৈশবকাল হতেই মানুষের	উপকারী বন্ধু ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। আদর্শ জীবনচরিতের বৈশিষ্ট্য কী?

২। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্মলগ্নে আরবের সামাজিক অবস্থার সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

৩। হযরত আবু বকর (রা.)-এর সত্যবাদিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স.)-এর ভূমিকা কী ছিল? বর্ণনা কর।

২। ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর ভূমিকা বর্ণনা কর।

৩। 'ফিকাহশাস্ত্রে' হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর অবদান বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। হযরত মুহাম্মদ (স.) নিম্নের কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল
খ. ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে রবিউল আউয়াল
গ. ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে রবিউল আউয়াল
ঘ. ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে রবিউল আউয়াল

২। জেরুজালেম যাওয়ার পথে ভৃত্যকে উটের পিঠে চড়িয়ে নিজে উটের রশি ধরার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন নিম্নের কোন খলিফা?

ক. হযরত উমর ফারুক (রা.)
খ. হযরত আবু বকর (রা.)
গ. হযরত উসমান (রা.)
ঘ. হযরত আলি (রা.)

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সৈয়দ রেজাউল হাসান ঐতিহ্যবাহী শ্রীপুর পাইলট স্কুলের প্রধান শিক্ষক। স্কুলের বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার ভবন তিনটি তিনদিকে অবস্থিত। স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি কমনরুম করার উদ্যোগ নিলে প্রত্যেক শাখার শিক্ষার্থীরা তাদের ভবনের সঙ্গে কমনরুমটি করার জন্য চাপ দিচ্ছিল। অবশেষে এটা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে রূপ নেয়। তখন প্রধান শিক্ষক মহোদয় তিন শাখার তিনজন সিনিয়র শিক্ষক ও তিনজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে মিটিং করে একটি সুন্দর জায়গায় স্থাপন করার প্রস্তাব দিলেন এবং সাথে সাথে সবাই সেটা মেনে নিলেন।

৩। প্রধান শিক্ষক মহোদয় নবিজির কোন ঘটনার আলোকে এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন?

ক. মোহর হিসাবে ২০টি উট প্রদান
খ. বাইতুলমাল থেকে সম্পদ বণ্টন
গ. হাজরে আসওয়াদ
ঘ. দারুন নদওয়া বৈঠকের সিদ্ধান্ত

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রূপনগর গ্রামে প্রভাব বিস্তার নিয়ে জসিম ও সিরাজ গ্রুপের মধ্যে সংঘাত লেগেই থাকে। একদিন মারামারি হওয়ায় খালেদ নামক এক তরুণ প্রহৃত হয়। এ দৃশ্য দেখে শান্তিপ্রিয় জনাব কামাল হোসেনের মাঝে চিন্তার উদ্রেক হয়। তিনি এলাকার সংঘাতময় অবস্থা দূর করার জন্য কিছু তরুণকে সঙ্গে নিয়ে 'প্রত্যাশা' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

৪। নিচের কোনটির সঙ্গে জনাব কামালের প্রতিষ্ঠিত 'প্রত্যাশা' সংগঠনটির সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. মক্কা বিজয়
খ. মদিনা সনদ
গ. হোদায়বিয়ার সন্ধি
ঘ. হিলফুল ফুযুল

৫। জনাব কামালের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজে মূলত—

ক. উন্নয়ন আসবে
খ. শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে
গ. বিজয় অর্জিত হবে
ঘ. শুভচেতনার উদয় হবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সাঈদ সাহেব একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রসারে এলাকায় একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এলাকার গরিব-দুঃখীদের অবস্থা চিন্তা করে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর স্ত্রী আফরোজা বেগম স্বামীর কাজকর্মে মুগ্ধ হয়ে নিজের ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়ে দান করে দেন।

ক. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দাদার নাম কী?
খ. মহানবি (স.)-কে কেন 'আল-আমিন' বলা হয়?
গ. পাঠ্যবইয়ে আলোচিত কোন মনীষীর আদর্শের সাথে সাঈদ সাহেবের কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. আফরোজা বেগমের কার্যক্রম তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

২০২৩

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠ–ইসলাম শিক্ষা

অশান্তি যুদ্ধ হতেও গুরুতর।

– আল কুরআন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।